সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বিপঞ্চাশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রবন্ধ-সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫২শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা
১৩৫২

রামপ্রসাদ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

রামপ্রসাদের "মালশী" গান প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গলার জনহৃদয়ে যে ঝঙ্কার তুলিতেছে, তাহার অনাবিল আনন্দময় রূপ চিরনবীন এবং তুলনাহীন। দুঃখের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত রামপ্রসাদের গ্রন্থ ও পদাবলীর একটি বিজ্ঞানসম্মত বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। বিগত ১০০ বৎসর মধ্যে রামপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে তিন জন মাত্র ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছেন—কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত[১], দয়ালচন্দ্র ঘোষ (১২৫৯-৯১)[২] এবং ৺অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[৩]। কিন্তু রামপ্রসাদের জীবনী-সংক্রান্ত অনেক কথাই এখনও বিতর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে নূতন গবেষণার ফলে কোন কোন বিষয়ের মীমাংসা সংক্ষেপে সূচিত হইল।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদের গান প্রধানতঃ দুই জন সাধকের রচিত বটে। তন্মধ্যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন অগ্রগণ্য সন্দেহ নাই।

বিক্রমপুরনিবাসী বৈদ্যপ্রধান গোপালকৃষ্ণ রায় পশ্চিমবঙ্গে সদর আমীন ছিলেন। ১২৫৬ সনের ১৯ ফাল্গুন (১৮৫০ খ্রীঃ) তিনি "অম্বষ্ঠসম্বাদিকা" নামে গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। তন্মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম রামপ্রসাদের কুলনির্দ্দেশ সহ মনোহর স্তুতিবাদ পাওয়া যায়।

ধলহণ্ডীয়-বংশীয়ো হালীশহরবাসকৃৎ।
রামপ্রসাদসেনোঽভূত্তত্বজ্ঞঃ সাধকঃ সুধীঃ।
প্রসাদাজ্জগদম্বায়াস্তত্বজ্ঞানান্বিতানি বৈ।
রচিতানি সুগীতানি তেনাম্বানামপূর্ব্বকৈঃ।
ন ভূতানি ন ভাব্যানি বর্ত্তমানানি নৈব চ।
তৎসদৃশানি গীতানি চান্যৈঃ কৈশ্চিৎ কদাচন। (পৃ. ৬৯)

প্রসাদের কুলকথা ১৩০৬ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পৃ. ২২৭-২৩৩) দ্রষ্টব্য। তাঁহার পিতামহ রামেশ্বর সেনের পুত্রের নাম ভরত মল্লিকের "চন্দ্রপ্রভা" গ্রন্থে (পৃ. ৫৫)

১। সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০ সনের ১লা আশ্বিন, ১লা পৌষ ও ১লা মাঘ-সংখ্যা এবং ১২৬১ সনের ১লা চৈত্র-সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২। প্রসাদ-প্রসঙ্গ, ১ম সং, ২৫ বৈশাখ ১২৮২ এবং ২য় সং, ১লা মাঘ ১২৮৩ দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলি বিশেষত্ববর্জ্জিত।

৩। রামপ্রসাদ, ১লা বৈশাখ ১৩৩০। এই বিপুলায়তন গ্রন্থ একটি অরণ্যবিশেষ; বহু নূতন তথ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট থাকিলেও পদে পদে পথভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা। অতুলবাবু ১৩৩৫ সনের ৩১ চৈত্র স্বর্গত হইয়াছেন।

কিম্বা তৎপরবর্ত্তী "রত্নপ্রভা" গ্রন্থে[৪] (পৃ. ২১) পাওয়া যায় না। অথচ রামেশ্বর সেনের শ্বশুর চায়ুদাস্‌বংশীয় রামেশ্বর "বাচস্পতি" ভরত মল্লিকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন, বাচস্পতির পিতৃব্যপুত্র গোবিন্দ কবিরাজ ভরত মল্লিকের ভগ্নীপতি ছিলেন (চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২৬৮, রত্নপ্রভা, পৃ. ৫৬)। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, চন্দ্রপ্রভারচনাকালে (১৫৯৭ শক—১৬৭৫-৬ খ্রীঃ) প্রসাদের পিতা রামরাম সেনের জন্ম হয় নাই, কিম্বা নিতান্ত শৈশব কাল। প্রসাদের আবির্ভাব-কালনির্ণয়ে ইহা একটি মূল্যবান্ নির্দ্দেশ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আবির্ভাবকাল : রামরাম সেনের জন্মাব্দ যদি ১৬৭০খ্রীঃ বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিধিরামের জন্মাব্দ ১৬৯৫ সনের পূর্ব্বে যাইবে না। নিধিরামের ৮ বৎসরকালে রামরামের ২য় পরিণয় হয় (রামপ্রসাদ, প্রসাদীকথা, পৃ. ৩৩৬) এবং রামপ্রসাদ তাঁহার মাতার তৃতীয় সন্তান (ঐ, পৃ. ৩২৫)। সুতরাং নিধিরামের সহিত রামপ্রসাদের বয়সের ব্যবধান ন্যূনকল্পে ১৫ বৎসর, ২০ বৎসর ধরাই যুক্তিসঙ্গত। তদনুসারে রামপ্রসাদের জন্মাব্দ কিছুতেই ১৭১০-১৫ সনের পূর্ব্বে যাইবে না—ইহাই তাঁহার আবির্ভাবকালের উর্দ্ধতম সীমা বলিয়া ধরা যায়। বস্তুতঃ নিধিরামের জন্ম ১৭০০ সনের পূর্ব্বে যাইবে না। প্রথমতঃ, হলওয়েল (১৭৫১ হইতে) ও গবর্নর ড্রেক (১৭৫২ হইতে) যাঁহাকে "মীরমুন্সী"-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন (ঐ, পৃ. ৩৩৭-৮), সেই নিধিরামের বয়স তৎকালে অনধিক ৫০ ধরাই যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, নিধিরামের প্রপৌত্র গঙ্গাচরণ সেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮১৩-৮৫) সহাধ্যায়ী ছিলেন (ঐ, পৃ. ৩৩৬)। তাঁহার জন্ম ১৮১০ সনে ধরিলেও নিধিরাম হইতে গঙ্গাচরণ পর্য্যন্ত তিন পুরুষে ১১০ বৎসর হয়—অর্থাৎ এক পুরুষের গড়পড়তা হয় প্রায় ৩৭ বৎসর। সুতরাং নিধিরামের জন্ম ১৭০০-১০ সনে ধরিয়া রামপ্রসাদের জন্মাব্দ স্থূলতঃ ১৭২০-৩০খ্রীঃ মধ্যে নির্ণয় করা যায়। ইহার সমর্থক প্রমাণ পরে আলোচিত হইল। ফলতঃ রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

ঈশ্বর গুপ্ত (প্রভাকর, ১লা পৌষ, ১২৬০, পৃ. ৯)[৫] রামপ্রসাদের জন্ম-মৃত্যুর কাল সূচনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

৪। রত্নপ্রভা (পৃ. ১৪ দ্রষ্টব্য) পরে রচিত হয়। কারণ, চন্দ্রপ্রভায় (পৃ. ৩২) ভারত মল্লিকের একটিমাত্র পৌত্রীর বিবাহের উল্লেখ আছে, কিন্তু রত্নপ্রভায় (পৃ. ১৪, ৭৪) দ্বিতীয় পৌত্রীর বিবাহ উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রপ্রভায় (পৃ. ২৬৮) ভগ্নীপতি গোবিন্দ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর অপত্যহীন, কিন্তু রত্নপ্রভায় জ্যেষ্ঠ দুই পুত্রই "পুত্রবর্জ্জিত" (পৃ. ৫৬)।

৫। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংবাদপ্রভাকরের এই সংখ্যাটি রক্ষিত আছে। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, এই প্রবন্ধের অনুলিপি যে অতুলবাবুর নিকট প্রেরিত হয় এবং তৎকর্ত্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮৪০ শক, আষাঢ় হইতে আশ্বিন-সংখ্যা) এবং 'রামপ্রসাদ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে (পৃ. ২২১-৪৩) "সম্পূর্ণ আকারে" প্রকাশিত হয়, তাহাতে অনুলিপিকারের অদ্ভুত অনবধানতায় দোষে ৪ পৃষ্ঠা (৯ হইতে ১২) সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে। ফলে, অতুলবাবুর আলোচনার অনেকাংশ (পৃ. ৩৭৬-৮৯ দ্রষ্টব্য) পণ্ডশ্রম হইয়াছে।

"৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহারপূর্ব্বক নিত্যধাম যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না।"

গুপ্তকবি পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, এই প্রবন্ধরচনার ২৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। তৎকালে নিঃসন্দেহ রামপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন জীবিত ছিলেন। এক স্থানে লিখিত আছে (ঐ, পৃ. ১০):—

"রামপ্রসাদ সেন যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন যোড়াসাঁকোর দোয়েহাটায় তাঁহার মাতুলবাটীতে বাস করিতেন। ৺চূড়ামণি দত্তের সহিত অত্যন্ত প্রণয় ছিল, সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন, তিনি অতি সুবক্তা ও প্রিয়ভাষী ছিলেন।"

রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের লেখাই সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। তদনুসারে রামপ্রসাদের মৃত্যু-সন গণনা করিলে ১১৮৯ বঙ্গাব্দের (১৭৮২ খ্রীঃ) পূর্ব্বে যাইবে না, ২।৩ বৎসর পরেও হাইতে পারে। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অনধিক ৬১।৬২ ধরিয়া তাঁহার জন্মাব্দ ১১২৮-৩২ সনের মধ্যে (১৭২১-৬ খ্রীঃ ও ১৬৪৩-৪৭ শক) নির্ণয় করিতে হইবে—পূর্ব্বেও নহে, পরেও নহে।

১৭৭৭ শকের ভাদ্র মাসে (১৮৫৫ খ্রীঃ) শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারিলাল নন্দী কালীকীর্ত্তনের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাহার ভূমিকায় যে রামপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত আছে, তন্মধ্যেই (পৃ. ৴৹) সর্ব্বপ্রথম ১৬৪০-৪৫ শকমধ্যে রামপ্রসাদের জন্ম অনুমিত হইয়াছে। এই অনুমানের মূল সূত্র যে গুপ্তকবির পূর্ব্বোদ্ধৃত "সিদ্ধবৎ" উক্তি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। পরবর্ত্তী সমস্ত লেখকই উক্ত শকাব্দ প্রায় একবাক্যে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন—অনেকেই গুপ্তকবির মূল প্রবন্ধ দেখেন নাই। আমাদের কালনির্ণয়ের সহিত এ স্থানে বেশী বিরোধ না থাকিলেও এই সকল নিষ্প্রমাণ বিচার-হীন কালনির্দ্দেশের কোনই মূল্য নাই। অতুল বাবুর গ্রন্থে ইহার নিষ্ফল আলোচনা দ্রষ্টব্য (৩৭৬-৮ পৃ.)।

গুপ্তকবি (পৃ. ৯) "প্রাচীন লোকেরা কহেন" এইরূপ নির্দ্দেশপূর্ব্বক রামপ্রসাদের মৃত্যুর ঘটনা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ৺শ্যামাপূজার পর দিন তাঁহার মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে একটি মূল্যবান্ অকাট্য প্রমাণ অতুল বাবু (জীবনী, পৃ. ১০৫ পাদটীকা) সংগ্রহ করেন যে, প্রসাদের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পুরুষানুক্রমে শ্যামাপূজার পর দিন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং "বৈশাখী পূর্ণিমায়" তাঁহার দেহরক্ষার কথা (পরিশিষ্ট, পৃ. ২৫৪) সম্পূর্ণরূপে অমূলক। কিরূপ অসম্ভব উক্তি মুদ্রিত গ্রন্থে স্থান লাভ করিতে পারে, এ স্থলে তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "রামপ্রসাদ" গ্রন্থে (২য় সং, পৃ. ৩৮১) লিখিত হইয়াছে,—

"আমরা তাঁহার পৌত্রের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি শতাধিক বর্ষ জীবিত ছিলেন। ...তাঁহার আত্মীয়ের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার বয়স ১১২ বৎসর স্থির করিলাম।"

তাহা হইলে, গণনা করিয়া পাওয়া যায় যে, কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মকালে তাঁহার

বয়স ছিল ১০০ বৎসর!!! রামপ্রসাদের মৃত্যুসন সম্বন্ধে এ যাবৎ যত আলোচনা হইয়াছে এবং অতুল বাবু প্রভৃতি যে বিচারপূর্ব্বক ১১৮১ সাল (১৭৭৪ খ্রীঃ) মৃত্যুসন ধরিয়াছেন (পৃ. ৩৭৯-৮১), তাহা সবই গুপ্তকবির মতবিরুদ্ধ হওয়ায় ভ্রমাত্মক এবং প্রমাদগ্রস্ত।

রামপ্রসাদের ভূসম্পত্তিঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজত্বকালে বাঙ্গলার সমস্ত নিষ্কর ভূমির বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। একটি আইন করিয়া (Act XIX of 1793, Article 25) নিষ্করের সনদাদি দলীল তলব করা হয়। তদনুসারে ১২০২ সন (১৭৯৫ খ্রীঃ) হইতে বাঙ্গলার সমস্ত জিলায় সনদ রেজিষ্টার, তায়দাদ প্রভৃতি বিপুল সংগ্রহ সঞ্চিত হয়। বিলুপ্যমান অনাদৃত এই সকল সংগ্রহের মধ্যে কিরূপ মূল্যবান্ তথ্য অন্তর্নিহিত আছে, তাহার একটি নিদর্শন এ স্থলে প্রদর্শিত হইল। তৎকালে হাভিলিসহর পরগণা নদীয়া জিলার অন্তর্ভুর্ত ছিল। উক্ত জিলার তায়দাদের সংখ্যা ৪৩৫০০ বটে। শ্রীরামদুলাল সেন সাং কুমারহট্ট "শন ১২০২ সাল ১৯ অগ্রহায়ণ" তাঁহার পিতা রামপ্রসাদ সেন নামীয় "মহাত্রাণ" সম্পত্তির বিবরণ চারিটি পৃথক সংখ্যায় দাখিল করেন। তাহাদের সারসংক্ষেপ এই।

তায়দাদ নং ১৮৩৪৭

৺সুভদ্রা দেবী ২ বৈশাখ ১১৬১ সনে "দানপত্র" করিয়া রামপ্রসাদ সেনকে হাবিলিসহর পরগণার নকুলবাটী গ্রামে "আন্দাজী" ১৷০ বিঘা জমি দান করেন—দখলকার পুত্র রামদুলাল সেন।

তায়দাদ নং ১৮৩৪৮

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৪ ফাল্গুন ১১৬৫ সনে তাঁহাকে ৫১৷০ একান্ন বিঘা জমী "সনন্দ" করিয়া দেন। যথা—

বউলপুর	১৮৷০	উখরা পরগণা
পদ্মনাভপুর	১৭৷০	ঐ
মামুদপুর	১৬৷০	হাবিলিসহর পরগণা।

তায়দাদ নং ১৮৩৪৯

দর্পনারায়ণ রায় ১৫ আষাঢ় ১১৬৫ সনে হাবিলিসহর পরগণার "তালডেঙ্গা" গ্রামে ২৷০ বিঘা জমী "সনন্দ" করিয়া দেন।

তায়দাদ নং ১৮৩৫০

দর্পনারায়ণ রায়, শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় একযোগে ১৭ চৈত্র ১১৬০ সনে ৮৷০ বিঘা জমী "সনন্দ" করিয়া দেন। যথা—

পলাসি	২৷০	হাবিলিসহর পরগণা
তেতুল্যা	২৷০	ঐ
বালিয়া	১৷০	ঐ
কাটাপুখরিয়া	১৷০	ঐ
ডাসি	২৷০	ঐ

রামদুলাল সেন প্রত্যেক তায়দাদের সঙ্গে "আসল সনন্দ দর্শাইয়া নকল দাখিল" করিয়াছিলেন। নদীয়া কালেক্টরীতে তন্মধ্যে প্রথম দুইটি নকল এখনও রক্ষিত আছে—শেষ দুইটি নাই।[৬]

সুভদ্রা দেবীর দানপত্রের নকল। (নং ১৮৩৪৭)

শ্রীকৃষ্ণ　　নকল　　শ্রীরাম
শরণং

শ্রীরামদুলাল সেন
সাং কুমারহট্ট

স্বস্তি সকলমঙ্গলালয় শ্রীযুত রামপ্রশাদ সেন
কল্যাণবরেষু লিখিতং শ্রীসুভদ্রা দেব্যা পত্রমিদং

কার্য্যঞ্চ আগে পরগণে হালিসহর সরকার শাতগড়ি পরগণা ম(ঞ্জ)কুরের নন্দনপুর নন্দনবাটি[৭] গ্রাম শর্ম্মঙ্গিয়ে (?) আমার বসতবাটীর দক্ষীণংসে শ্রীযুত রামহরি চক্রবর্ত্তির ভদ্রাশনের দক্ষীণ চতুসিম্যবৎছর্ন্ন সরুক্ষা বাটি খারিজজমা তোমাকে বসতি করিতে বৈদ্যত্তর মহাত্রাণ দিলাম তুমি বাটীতে বসতি করিয়া পুত্রপৌত্রাদীক্রমে পরমসুখে ভোগ করহ আমার শহিত এবং আমার উত্রাধিকারির শহিত কোন দয়া নাই বাটীর সিমা নিরর্ন্ন্য় উত্তরে রামহরি চক্রবর্ত্তির ভদ্রাশনের দক্ষীন দ(ক্ষি)নে শমেত পরিখা পুর্ব্বে শমেত পরিখা পশ্চীমে রামরায়ের মহম্মবাটী এই চতুসিম্যবৎছর্ন্ন বাটী তোমারে মনোত্রাণ দিলাম ইতি শন ১১৬৫ এগারো শওয়া পয়সষ্টী সাল তারিখ ২ দোসারা বৈসাখ—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সনদের নকল। (নং ১৮৩৪৮)

নকল　　শ্রীশ্রীরাম
শরণং

পারশী
১৫৮৩
ইঙ্গরাজী

শ্রীরামপ্রসাদ সেন সুচরিতেষু শুভাসীঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ এ অধিকারে তোমার ভূমিভাগ কিছু নাহি অতএব বেওয়ারিষ গরজমা জঙ্গলভূমি সমেত পতিত পরগণে হাবেলীসহর ১৬ ষোল বিঘা এবং পরগণে উখড়ায় ৩৫ পয়ত্রিষ বিঘা একুনে ৫১ একান্ন বিঘা তোমাকে মহোত্তরাণ দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ ইতি সন ১১৬৫ তারিখ ৪ ফাল্গুন শহর—

৬। এ স্থলে নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তিনি এবং মহাফেজখানার সুযোগ্য কর্ম্মচারিগণ অনুমতি এবং সুযোগ দান করিয়া এই সকল চিরলুপ্ত রত্নোদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ধন্য হইয়াছেন।

৭। নকুলপুর ও নকুলবাটিও পড়া যায়। দানপত্রে ভূমির পরিমাণ লিখিত নাই। তায়দাদে রামদুলাল সেন "আন্দাজী" ১/০ এক বিঘা লিখিয়াছেন।

রামপ্রসাদের স্বগ্রামবাসী চারি জন পৃষ্ঠপোষকের মধ্যে সুভদ্রা দেবীর পরিচয় অজ্ঞাত। বাকী তিন জন বিখ্যাত "সাবর্ণ চৌধুরী" বংশীয় বটে এবং সুভদ্রা দেবীও ঐ বংশীয় হইতে পারেন। দর্পনারায়ণ রায় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের অধস্তন সপ্তম পুরুষ[৮]।

গুপ্তকবি (প্রভাকর, ১লা পৌষ, ১২৬০, পৃ. ৭) সম্ভবতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্ধৃত সনন্দপত্রের কথাই পরিজ্ঞাত হইয়া প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, যদিও হাবেলী সহরের ১৬ বিঘার স্থানে ১৪ বিঘা হইয়াছে এবং সনন্দের পাঠ মিলিতেছে না।

এই সকল সনন্দ আবিষ্কারের ফলে রামপ্রসাদের জীবনী ঘটিত কতিপয় বিষয়ের মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের সনন্দের তারিখ ১৭৫৯ খ্রীঃ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কোন দলীলেই "কবিরঞ্জন" উপাধির উল্লেখ নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত বহুতর সনন্দের মূল কিম্বা প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। দানভাজন ব্যক্তিদের উপাধি সর্ব্বত্রই লিখিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতচন্দ্রের সনন্দের প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হইল। ইহার "নকল" তদীয় পুত্রদ্বয় ভাগবতচরণ ও রামতনু রায় ২১ অগ্রহায়ণ ১২০২ সনে নদীয়া কালেক্টরীতে দাখিল করেন (২০৩৩৭ সংখ্যক তায়দাদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

শ্রীতরঙ্গ

নকল

শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর

সদুদারচরিতেষু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণো

নমস্কারঃ শিবং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ

সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনণ্ডরপুর চাকলায় বসতি করিয়াছ অতএব চাকলা মজকুরে বেওয়ারেশ গরজমাই উচ্ছট বাস্তু ও লায়েক বাগাতি জঙ্গলভূমি ২১ একইশ বিঘা এবং বেলায়তি সমেত পতিত জঙ্গলভূমি ৫১ একাওন্ন বিঘা একুনে ৭২/০ বাওত্তর বিঘা বৃত্তি দিলাম বাস্তুতে সপরিবারে বসতি করিয়া বাগাতি জমিতে বাগিচা করিয়া জঙ্গলভূমি নিজজোতে ভোগ করহ ইতি সন ১১৫৬ ছাপ্পান্ন—১ আগ্রহায়ণ।

এই মূল্যবান্ সনন্দানুসারে ১৭৪৯ সনে কিম্বা তৎপূর্ব্বে ভারতচন্দ্র "গুণাকর" উপাধি পাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, ১৭৫৯ সনেও রামপ্রসাদ

---

[৮]। বংশাবলী যথাঃ— লক্ষ্মীকান্ত—রামরায়—জগদীশ রায়—বিদ্যাধর রায়—সন্তোষ রায়—মনোহর রায়—দর্পনারায়ণ রায়। অপর শাখা, বিদ্যাধর রায়—রঘুদেব রায়—কালীচরণ রায়। "কুমারহট্টবাসী" (সাঙ্কাভাঙ্গার কুলপঞ্জী, ৩৬৮খ পত্র)। লক্ষ্মীকান্ত-মানসিংহ ঘটিত যে সকল কাহিনী দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অমূলক। বস্তুতঃ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার মানসিংহের অন্ততঃ এক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এবং খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন—রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী সামান্য আলোচনা করিলেই ইহা প্রতিপন্ন করা যায়।

"কবিরঞ্জন" উপাধি অর্জ্জন করেন নাই। ফলে, বিদ্যাসুন্দর ও কালীকীর্ত্তন রচনার তারিখ ১৭৬০ সনের পূর্ব্বে কিছুতেই যাইবে না এবং রামপ্রসাদ যে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ৬২-৩), গুপ্তকবি (পৃ. ৬) প্রভৃতি বহু লেখকের অনুমান এ স্থলে প্রমাণ-সিদ্ধ নহে।

বিদ্যাসুন্দর রচনাকালে রামপ্রসাদের তিন সন্তানের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং তৎকালে তাঁহার বয়স ৩৫-৪০ হইবে[৯]। বিদ্যাসুন্দরের রচনাকাল ১৭৭০ সনের পরে যাইবে না। কারণ, তখনও তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান রামমোহনের জন্ম হয় নাই। রামমোহনের জন্মতারিখ প্রায় ১৭৭০ খ্রীঃ[১০]। সুতরাং রামপ্রসাদের গ্রন্থরচনার কাল ১৭৬০-৭০ সনের মধ্যে ধরিয়া তাঁহার জন্মকাল স্থূলতঃ ১৭২০-৩০ সনের মধ্যে নির্ণয় করার সমর্থন পাওয়া যায়।

কালীকীর্ত্তনের তিন স্থলে রামপ্রসাদের এক পৃষ্ঠপোষক "রাজকিশোরে"র নাম পাওয়া যায়। তাঁহার পরিচয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হয় নাই। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রাজকিশোরের নামের সহিত কোন বিশেষণ-পদ নাই। তিনি সম্ভবতঃ রামপ্রসাদের কোন ধনী আত্মীয় ছিলেন এবং "তীর্থমঙ্গল" গ্রন্থোক্ত হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায় ঠিক এই সময়েই নিকটে বিদ্যমান থাকায় তাঁহাকে অভিন্ন ধরাই যুক্তিযুক্ত (প্রসাদী কথা, পৃ. ৩৫৪-৫৭); যদিও এই দেওয়ানের কোন পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যায় না।

রচনাবলী: রামপ্রসাদের "কালীকীর্ত্তন" গ্রন্থই প্রথম প্রচার লাভ করে। ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে (*The Hindoos*, London, 1822, Vol. II, p. 478) ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় :—Kalee-Keerttunu by Ramu prusadu & Shoodru (?)। অন্যত্রও (Vol. III, p. 300-1) "গীত" রচনার বিবরণীমধ্যে কালীকীর্ত্তনের নাম পাওয়া যায়।

কালীকীর্ত্তন বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তই ১৮৩৩ সনে, বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম ইহা মুদ্রিত করেন (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃ. ৫৫-৬৩, এই সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে)। ঐ সময়ে আর একটি সংস্করণও মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বিবরণ উদ্ধার করা যায় নাই।[১১]

৯। দয়াল ঘোষ ১২৮২-৩ সনে রামপ্রসাদের পৌত্র দুর্গাদাস এবং দুই জন প্রপৌত্র গোরাচাঁদ ও গোপালকৃষ্ণকে জীবিত পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট জানিয়া ২য় সংস্করণে যে সকল নূতন কথা লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি এই—"দ্বাবিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি দারপরিগ্রহ করেন" (পৃ. ১৬)। সুতরাং বিদ্যাসুন্দর রচনাকালে রামপ্রসাদের বয়স ন্যূনকল্পে ৩৫ ধরা যায়।

১০। রামমোহনের পৌত্র গোপালকৃষ্ণ ২৯।৪।১৮৯৫ তারিখে "৭৩" বৎসর বয়সে স্বর্গী হন অর্থাৎ তাঁহার জন্মসন ১৮২২-৩ খ্রীঃ—তৎকালে রামমোহনের বয়স ন্যূনকল্পে ৫০ ধরিলে তাঁহার জন্মতারিখ হয় ১৭৭২-৩ খ্রীঃ। দ্বিতীয়তঃ রামমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র দুর্গাদাস সেন ১২৯৩-৪ সনে "প্রায় ৮০" বৎসর বয়সে স্বর্গী হন অর্থাৎ অনুমান ১৮১০ সনে তাঁহার জন্ম ধরা যায়। তৎকালে রামমোহনের বয়স ৪০ ধরা যায়। আমরা সম্বাদ দুইটি গোপালকৃষ্ণের পৌত্র মানসবাবু এবং দুর্গাদাসের পৌত্র রামরঞ্জন বাবুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

১১। ১৭৭৭ শকের ভাদ্রের সংস্করণে ২২-২৩ বৎসর পূর্ব্বের "দুইটি" সংস্করণের উল্লেখ আছে (পৃ. ৩৩ পাদটীকা)। লঙ্ সাহেব (দীনেশ সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, App., p. 704) ১৮৪৫ সনের একটি ২০ পৃষ্ঠার সংস্করণের উল্লেখ করেন। ১২৬২ সনের ৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যা সংবাদপ্রভাকরে "নিউপ্রেস" হইতে প্রকাশিত কালীকীর্ত্তনের বিজ্ঞাপন আছে (মূল্য ৵০)। ১৭৭৭ শকের ভাদ্রের সংস্করণ হইতে ইহা পৃথক্।

১৭৭৭ শকে দুইটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। রামপ্রসাদের দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ "কবিরঞ্জন-বিদ্যাসুন্দর"। লঙ্ সাহেব (দীনেশ সেন: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, App., p. 680) "হালি সহরের রামপ্রসাদ" রচিত বিদ্যাসুন্দর-বিষয়ক "কবিরহস্য" (?) গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া "রামপ্রসাদ সেন" রচিত "কলি (? বি) রঞ্জন" গ্রন্থের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, এক বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থেরই দুইটী পৃথক সংস্করণ এইরূপ বিকৃত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল সংস্করণ এখন অপ্রাপ্য। পরিশেষে ১৭৮৪ শকে (১৮৬২ খ্রীঃ) "কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ" নামে বটতলা "বিদ্যারত্ন যন্ত্র" হইতে বিস্তৃত জীবনী সহ রামপ্রসাদের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে (পৃ. ৩), "আমরা কবিরঞ্জনের যে কিছু রচনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তত্তাবতই এই গ্রন্থে গ্রন্থিত হইয়াছে।" এই মূল্যবান্ সংস্করণই দয়াল ঘোষের উপজীব্য ছিল। ইহাতে বিদ্যাসুন্দর (পৃ. ১-১৮৭), কালীকীর্ত্তন (পৃ. ১৮৯-২১৯) ও কৃষ্ণকীর্ত্তন (পৃ. ২২১-২) ব্যতীত সর্ব্বপ্রথম রামপ্রসাদের মোট ৯১টী পদাবলী (পৃ. ২২৩-৭৭) মুদ্রিত হয়, মধ্যে (পৃ. ২৪৩-৪৬) "সীতার বিলাপোক্তি"ও আছে। একজন প্রথিতনামা সাহিত্যিক (ডক্টর সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃ. ৮৮৭) অতিরিক্ত সাবধান হইয়া লিখিয়াছেন, কবিরঞ্জনই যে গীতকার, জনশ্রুতি ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ নাই। তিনি লক্ষ্য করেন নাই, অতুলবাবুর সংগৃহীত ২৬৫ সংখ্যক পদে "হালিসহর পরগণায় বসত, কুমারহট্ট গ্রামবাসী" লিখিত আছে। উক্ত সংস্করণে গুপ্ত কবির সংগৃহীত উপকরণ লইয়া "নন্দলাল দত্ত" যে বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত (পৃ. ।০-৩৵০) লিখিয়াছেন, তাহা সুরচিত এবং প্রায় প্রমাদহীন। গুপ্তকবি সংবাদপ্রভাকরের ১২৬০ সনের ১লা আশ্বিন-সংখ্যায় ৭টি গান প্রথম প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী ১লা পৌষ সংখ্যায় জীবনীর সহিত মোট ৩০টি পদাবলী মুদ্রিত হয়। তন্মধ্যে একটি ('এই সংসার ধোকার টাটি') পূর্ব্বপ্রকাশিত, দুইটি কালীকীর্ত্তনের এবং একটি ('প্রথম বয়স') কৃষ্ণকীর্ত্তনের। বাকী ২৬টি নূতন—১০টি সমর-সঙ্গীত, একটি আগমনী ('ওগো রাণি!'), বিজয়া ('ওহে প্রাণনাথ'), ষট্‌চক্রভেদ, রূপবর্ণন ('জগদম্বা কুঞ্জবনে', কালীকীর্ত্তনের অন্তর্গত, কিন্তু অপ্রকাশিত) ও ১২টি মালসী। ১২৬১ সনের ১লা চৈত্র সংখ্যায় সীতার বিলাপোক্তি, শিবসঙ্গীত (১), শবসাধন (১), নৌকাখণ্ড (২), প্রথমাবস্থার গীত (৭টি), নামমালা ও স্তব (৩টি), আগমনী (১), কালীকীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রী, রণবর্ণনা (১), মধ্যমাবস্থার গীত (১২টি) ও শেষাবস্থার গীত (৫টি)—মোট ৩৫টি নূতন প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যার ১২ পৃষ্ঠার পর শেষাংশ পাওয়া যায় নাই—তাহাতে আরও কয়টি গান ছিল, জানিবার উপায় নাই। সুতরাং রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত প্রায় সমস্তই গুপ্তকবিই কালগ্রাস হইতে রক্ষা করেন এবং বটতলা সংস্করণের ৯১টি পদের মধ্যে অন্ততঃ ৬৬টিই গুপ্তকবি দ্বারা প্রকাশিত বটে।[১২]

১২। অতুলবাবু ১২৬০ সনের ১লা পৌষ সংখ্যার ৪ পৃষ্ঠা (তন্মধ্যে মোট ১৬টি পদ আছে) দেখেন নাই এবং ১২৬১ সনের ১লা চৈত্র সংখ্যারও সন্ধান পান নাই। "গুপ্তকবি মাত্র কুড়িটি পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন"—তাঁহার এই উক্তি (প্রসাদী-কথা, পৃ. ৩৯৬ পাদটীকা) সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

দ্বিজ রামপ্রসাদ

গুপ্তকবি এবং দয়াল ঘোষ, উভয়েই মৌলিকভাবে রামপ্রসাদের গান সংগ্রহ করিতে গিয়া কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের অপর একজন সাধনসঙ্গীতকার রামপ্রসাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন। গুপ্তকবি লিখিয়াছেন (প্রভাকর, ১২৬০, ১লা পৌষ, পৃ. ৭) :—

পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা, সেরাজগঞ্জ, ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্ব্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহারদিগের এত ভক্তি যে, যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না। কহে "বাসী কাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাহিলে নরকে যাইতে হইবে।"

বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে যে সকল গানের প্রচার ছিল না, তাহার রচয়িতা কবিরঞ্জনও নহে এবং কবিওয়ালা রামপ্রসাদও নহে। গুপ্তকবি কবিওয়ালা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কবিওয়ালা শক্তি-সাধক ছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

দয়াল ঘোষ প্রথমেই পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ শক্তি-সাধক এই দ্বিতীয় রামপ্রসাদের পরিচয়ের সূত্র লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সময়াভাবে এবং গবেষণার অপরিপক্বতায় এ বিষয়ে তথ্যলাভে সমর্থ হন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

কেহ বলিল, তাঁহার বাড়ী মহেশ্বরদি পরগণায়, (প্রসাদপ্রসঙ্গ, ১ম সং, ভূমিকা, পৃ. ৯)...এক্ষণ আর একটি গুরুতর গোলের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্ব্ববাঙ্গলায় অনেকেরই এরূপ অবগতি, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমারও এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদ 'দ্বিজ' ছিলেন। (ঐ, পৃ. ১৩)

মূল্যবান্ নির্দ্দেশ পাইয়াও দয়াল ঘোষ কিরূপ অর্ব্বাচীনের মত অকাতরে তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মহেশ্বরদি ঢাকা জিলার একটি নাতিবৃহৎ পরগণা। রামপ্রসাদের বাসগ্রামের সন্ধান তিনি অল্পায়াসেই পাইতে পারিতেন। উভয় রামপ্রসাদের গানের বিভাগও কেবল তিনিই পরিজ্ঞাত হইয়াও স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—

—'কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহে' যে সকল সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও কোন কোনটি দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। (ঐ, পৃ. ১৫)

বর্ত্তমানে উভয়ের সঙ্গীত পৃথক্‌ভাবে মুদ্রিত করা অসাধ্য না হইলেও অত্যন্ত দুরূহ। দয়াল ঘোষের গ্রন্থপ্রকাশের ২৫ বৎসর পরে "সাধকসঙ্গীতে"র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০৬ সন) ৺কৈলাস সিংহ পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর অস্তিত্ব সর্ব্বপ্রথম স্বীকার করেন। কিন্তু জন্মস্থান ব্যতীত তিনিও তাঁহার বিবরণ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেবল, উভয়ের তুলনামূলক আলোচনায় (অবতরণিকা, পৃ. ৪৬-৫৯) স্বকীয় মজ্জাগত বৈদ্যবিদ্বেষের ফলে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের উপর স্থানে স্থানে অন্যায়ভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন।

অতঃপর "দ্বিজ রামপ্রসাদ" সম্বন্ধে যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছেন, প্রায় সকলেই গবেষণার পবিত্র ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে ত্রুটি করেন নাই। অতুলবাবুর গ্রন্থের এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ (পৃ. ২৪৬-৫৮) এইরূপ একটি বিষোদ্‌গার—বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা বহু দূরে পলায়ন করিয়াছে।

দ্বিজ রামপ্রসাদের বিস্তৃত বিবরণ তদীয় বংশধর ৺চন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী (মৃত্যু, অগ্রহায়ণ ১৩৩০) "আর্য্যদর্পণ" পত্রিকায় প্রকাশ করেন[১৩]। পুরুষ-পরম্পরা-প্রচলিত বহু তত্ত্ব তন্মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকিলেও আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁহার একটি মারাত্মক ভ্রম সংশোধন করিব। অদ্ভুত স্বপ্ন ও তিন জন মাত্র ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন (মাঘ ১৩১৯, পৃ. ২৩২-৪০) যে, সাধক রামপ্রসাদ রাজসাহীনিবাসী ছিলেন এবং রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর ভাই ছিলেন। দত্তক গ্রহণের পর তিনি বিবেকী হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। আমরা রামপ্রসাদের সাধন-পীঠ চিনীশপুর অঞ্চলে এই অমূলক প্রবাদের কথা শুনিয়াছি। রাজসাহীতে সামান্য অনুসন্ধান করিলেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিতেন। রাজা রামকৃষ্ণের পিতা হরিদেব রায়কে ১১৬৮ সালের ২১ জ্যৈষ্ঠ রাণী ভবানী "তালুক পত্র" দ্বারা মূল্যবান্ সম্পত্তি দান করেন (দুর্গাদাস লাহিড়ী : রাজা রামকৃষ্ণ, ২য় সং, ১৩১৮, পৃ. ৪৫২-৫৯)। ঐ সময়ে ভবানীপ্রসাদ, রামপ্রসাদ এবং রামকৃষ্ণ, তিন সহোদরই বাল্য অতিক্রম করেন নাই। এই "অতিপ্রসিদ্ধ এবং মাননীয়" বংশের নামমালা মুদ্রিত হইয়াছে (কালীনাথ রায় : রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৩০৮, পৃ. ৩১৩ (পরিশিষ্ট) ৫নং বংশলতিকা)। তদ্দৃষ্টে জানা যায়, রামপ্রসাদের দুই পুত্রের বংশই এখনও বিদ্যমান এবং তাঁহার এক পৌত্র হরনাথ নাটোরের রাণী জয়মণির দত্তক পুত্র ছিলেন। আমরা কুলগ্রন্থে দেখিয়াছি, এই রামপ্রসাদ পাকুড়িয়ার বিখ্যাত ঠাকুরবংশে ২টি বিবাহ করিয়াছিলেন। দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া থাকিলেও ১৭৭০-৮০ সনের পূর্ব্বে তাহা ঘটে না। আমরা পরে দেখিব, চিনীশপুরের রামপ্রসাদ প্রায় এক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। বস্তুতঃ এই রামপ্রসাদের গৃহত্যাগের কথা অলীক। রাজা রামকৃষ্ণই বিবেকী হইয়া ভবানীপুর তীর্থে আশ্রয় নেওয়ার পূর্ব্বে নিজ "সহোদরগণ"কে সম্পত্তি দিয়াছিলেন (রাজা রামকৃষ্ণ, পৃ. ৪২৫)। দ্বিতীয়তঃ, চিনীশপুরের রামপ্রসাদের সম্পর্কিত সকলেই রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। রাঢ়ী বারেন্দ্র সম্বন্ধ তৎকালে সামাজিক হিসাবে প্রায় অসম্ভব ছিল এবং সম্ভব হইলেও তাহার স্মৃতি সহজে বিলুপ্ত হইত না। এইরূপ কোন প্রবাদ ঘুণাক্ষরেও তদঞ্চলে বিদ্যমান নাই।

দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান। আমরা সন্দেহ অপনোদনের

১৩। ১৩১৯, শ্রাবণ (পৃ. ৮৯-৯১), আশ্বিন (পৃ. ১৪১-৪২), কার্ত্তিক (পৃ. ১৪৫-৬), অগ্রহায়ণ (পৃ. ১৮৫-৯০), পৌষ (পৃ. ১৯৩-৬), মাঘ (পৃ. ২৩২-৪০) ও ফাল্গুন (পৃ. ২৪১-৪৩)। ১৩২০, বৈশাখ (পৃ. ১৯-২৩), জ্যৈষ্ঠ (পৃ. ২৫-২৮), আশ্বিন (পৃ. ১৩০-৩২ সম্পাদকের মন্তব্য)।

জন্য দুইটি লিখিত প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দিলাম। দয়াল ঘোষের অনুসন্ধানকালে বিক্রমপুরের বিখ্যাত শক্তিসাধক রাজমোহন আম্বলি তর্কালঙ্কার (১২৩১-৯৩) জীবিত ছিলেন (প্রসাদপ্রসঙ্গ, ভূমিকা, পৃ. ১৩)। তাঁহার গান ও জীবনী মুদ্রিত হইয়াছে ("সাধক রাজমোহন", ১৩২৪)। তাঁহার জীবনী পাঠে জানা যায়, চিনীশপুরে অর্থাৎ রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠে তিনি আত্মকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন (পৃ. ১।০)। তিনি স্বয়ং তাঁহার তিনটী গানে (৮৪, ৯২ ও ১০৩ সংখ্যক) সাধনপথে "রামপ্রসাদের রা" পাওয়ার কথা লিখিয়াছেন। রাজমোহনের পক্ষে কুমারহট্টের সিদ্ধপীঠ হইতে 'রা' পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। ২৯২ সংখ্যক গানে যে সকল শক্তিসাধকের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে—ব্রহ্মাণ্ড গির, গোসাই ভট্টাজ, রামচন্দ্র, সর্ব্ববিদ্যা, পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, রাজা রামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদ—তাঁহারা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গে পরিচিত।

ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণাংশে খণ্ডল পরগণার "মধুগ্রাম" এক সময়ে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঐ গ্রামের অভয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য ১৮২৫ শকে "আদিবৃত্ত" নামে একটি বংশবৃত্তান্ত রচনা করেন, তাহার পুথি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। এক স্থলে সিদ্ধ পুরুষদের একটি অদ্ভুত নামমালা আছে (পৃ. ১০)। যথা, "শ্রীধর স্বামী, ব্রহ্মাণ্ডগিরি, শঙ্করাচার্য্য, ভাণ্ডরী স্বামী, পূর্ণানন্দ স্বামী, জয়দেব গোস্বামী, গুরু রামানন্দ স্বামী, গুরু নানকজী, সর্ব্ববিদ্যা-সর্ব্বানন্দ ঠাকুর, **রামপ্রসাদ ঠাকুর,** গোরক্ষনাথ, মীননাথ, অভিরাম স্বামী, মুকুন্দরাম স্বামী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, নয়ন ভট্টাচার্য্য ঠাকুর, গুংতিবন, গোসাই ভট্টাচার্য্য, মহারাজ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।" কবিওয়ালা রামপ্রসাদও "ঠাকুর" ছিলেন বটে, কিন্তু "যে সকল সিদ্ধ পুরুষের নাম স্মরণেও ধর্ম্মসঞ্চয় হইয়া থাকে", তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন না নিশ্চিত।

রামপ্রসাদের পূর্ব্বজীবন এখন পর্য্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত রহিয়াছে। আর্য্যদর্পণে (বৈশাখ, ১৩২০, পৃ. ২০) লিখিত হইয়াছে, "তাঁহার পৈতৃক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে গেলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রটী ও সহধর্ম্মিণী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।" এই প্রবাদের সমর্থন দারিদ্র্য-সূচক কোন কোন গান হইতে পাওয়া যায়। রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর রামপ্রসাদ রায়ের পূর্ব্বজীবনের সহিত এ স্থলে ঘুণাক্ষরেও কোন মিল নাই। স্বর্গত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার "স্বপ্নলব্ধ" বৃত্তান্তের সহিত বিরোধ তলাইয়া না দেখিয়া অকপটে একটি তথ্যমূলক প্রাচীন প্রবাদই এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। তাঁহার সাধন-সংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনা আমরা বৃদ্ধমুখে এইরূপ শুনিয়াছি।—কামাখ্যায় সাধন করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। রামপ্রসাদের প্রার্থনানুসারে দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহার গৃহে[১৪] যাইতে স্বীকৃত হন, রামপ্রসাদ পথপ্রদর্শন করিয়া অগ্রে যাইবেন, পশ্চাতে দেবী নূপুরধ্বনি করিয়া চলিবেন, কিন্তু রামপ্রসাদ ফিরিয়া তাকাইতে পারিবেন না। ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে আসিয়া বর্ত্তমান চিনীশপুর গ্রামে চরের

১৪। প্রবাদ অনুসারে রামপ্রসাদের বাড়ী ছিল ব্রহ্মপুত্রের 'পুবপারে' ত্রিপুরা জিলার উত্তরাংশে স্থিত কোন অখ্যাত পল্লীতে। তিনি নিজ বাড়ীর নিকটেই প্রায় পৌছিয়াছিলেন।

বালুকা ঢুকিয়া নূপুরধ্বনি বন্ধ হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে যে স্থানে "ত্রিবট" রহিয়াছে, সেই স্থান হইতে রামপ্রসাদ ফিরিয়া তাকাইলেন এবং দেবীও দর্শন দিয়াই অদৃশ্য হইলেন। ঠিক যে স্থানে দেবী-দর্শন হয়, সেই স্থানেই পঞ্চমুণ্ডী স্থাপন ও পরে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

চিনীশপুর অতি দুর্গম স্থান ছিল এবং ভৈরব-টঙ্গি রেল খোলার পরও সুগম নহে। দয়াল ঘোষ হইতে অতুল বাবু পর্য্যন্ত কেহই চিনীশপুর আসেন নাই। দ্বিজ রামপ্রসাদের বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, একজন ভিন্ন[১৫] তাঁহাদের মধ্যে কেহই স্থানীয় গবেষণা লব্ধ শ্রদ্ধা ও আনন্দ খুঁজিয়া পান নাই।

রামপ্রসাদের বংশাবলী :—চিনীশপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির বিষয়ে বহুতর প্রাচীন দলীলপত্রাদি বিদ্যমান আছে। আমরা তাহার অনেকাংশ পরীক্ষা করিয়া দেখার সুযোগ পাইয়াছি। রামপ্রসাদ চিনীশপুরের সংলগ্ন টেঙ্গুরীপাড়ানিবাসী জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে দেবীর আদেশে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান কন্যা জগদীশ্বরীকে সংলগ্ন ব্রাহ্মণদি গ্রামনিবাসী কেবলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। জগদীশ্বরীর দুই পুত্র—শম্ভুচন্দ্র ও মধুসূদন। মধুসূদনের তিন পুত্র,—কালিদাস, রাধানাথ (১২৬০ সনের শেষ ভাগে, ১৮৫৪ খ্রীঃ স্বর্গী হন) ও জগন্নাথ (১২৭২ সনের অগ্রহায়ণ মাসে স্বর্গী হন)। মধুসূদনের কন্যা ভৈরবী দেবী অনতিদূরবর্ত্তী মাধবদি গ্রামের পাকড়াশীবংশীয় রামনরসিংহ চক্রবর্ত্তীর পত্নী ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র (রাজচন্দ্র) এবং তিন কন্যা—বিশ্বেশ্বরী, রাধালক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা। বিশ্বেশ্বরী, মহেশ্বরদির ব্রাহ্মণসমাজের শীর্ষস্থানীয় পারলীয়ার চক্রবর্ত্তিবংশীয় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণির দ্বিতীয় পত্নী। বিশ্বেশ্বরীর একমাত্র পুত্র ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৩২৬ সনের ২৬ কার্ত্তিক ৮৬ বৎসর বয়সে স্বর্গী হন। উদ্ধৃত নামমালা ঈশানচন্দ্রই মাতুল ও মাতামহের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্রের দুই পুত্র—চন্দ্রকিশোর ও কাশীচন্দ্র। কাশীচন্দ্রের পুত্র শ্রীমান্ কুলভূষণ চক্রবর্ত্তী এম্ এ এখন বিদ্যমান।

পক্ষান্তরে, রামপ্রসাদের শ্বশুর জয়নারায়ণের পুত্র শ্রীনারায়ণ। তৎপুত্র বলরাম, সুদাম ও শ্রীদাম। বলরামের পুত্র কালিদাস, গঙ্গাদাস (জাত্যন্তর) ও শম্ভুনাথ। শম্ভুনাথ, সংক্ষেপে শম্ভু ঠাকুর, অতি বিখ্যাত সাধক ছিলেন। চিনীশপুরের পরবর্ত্তী অলৌকিক ঘটনাবলী তাঁহার সময়েই ঘটে। তাঁহার একমাত্র পুত্র শিবনাথের মৃত্যুর পর তিনি দানপত্র করিয়া (২৬ আষাঢ় ১২২৬ সনে) দেবোত্তর সম্পত্তির স্বকীয় অর্দ্ধাংশের এক অংশ ভাগিনেয়ীপুত্র রামকানাই চক্রবর্ত্তীকে এবং অপর অংশ স্বর্গত ভাগিনেয় বিশ্বনাথের তিন পুত্র ঈশান, ভৈরব ও রাজচন্দ্রকে দিয়া যান। ইহারা সকলেই নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে অন্য উত্তরাধিকারী সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

রামপ্রসাদের কালনির্ণয় : ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জন্ম ১৮৩৪ সনে। বিশ্বেশ্বরী ও ভৈরবীকে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান ধরিয়া, প্রথম সন্তানোৎপত্তির বয়স ন্যূন পক্ষে স্ত্রীলোকদের ১৫ এবং

১৫। পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত প্রবন্ধই (প্রতিভা, ১৩১০, পৃ. ৬৯৬-৭০৪) দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং যুক্তিপূর্ণ।

পুরুষের ২৫ ধরিয়া জগদীশ্বরীর জন্মসন হয় ১৭৬২ খ্রীঃ। চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াও ইহার পরে আনা যায় না। পক্ষান্তরে, শম্ভু ঠাকুরের দানপত্রকালে (১৮৪৯ খ্রীঃ) তাঁহার ভাগিনেয়পুত্র ঈশানের বয়স ন্যূনকল্পে ২০ ধরিয়া ঐরূপ চূড়ান্ত গণনায় শ্রীনারায়ণের জন্মসন হয় ১৭৪০ খ্রীঃ। তাঁহার ভগিনী, অর্থাৎ রামপ্রসাদের পত্নী, সম্ভবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; কারণ, শ্রীনারায়ণের সহিত তাঁহার ভাগিনেয়ীপুত্র (ভাগিনেয় নহে) শম্ভুচন্দ্রের সম্পত্তি-ঘটিত বিরোধ চলিয়াছিল। সকল দিক্ বিবেচনা করিলে ১৭৫০-৫৫ সন মধ্যে জগদীশ্বরীর জন্ম নির্ণয় করাই যুক্তিযুক্ত এবং রামপ্রসাদের চিনীশপুরে আগমন ১৭৪৫-৫০ সন মধ্যে নির্ণয় করা যায়। সুতরাং তিনি কবিরঞ্জন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং উভয়েরই অভ্যুদয়কাল প্রায় এক। রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর রামপ্রসাদ যে ইহাঁদের অপেক্ষা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

দেবোত্তর সম্পত্তি: চিনীশপুর প্রভৃতি গ্রাম বস্তুতঃ মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্ভূ্ত নহে, পরন্তু ত্রিপুরা জিলার প্রসিদ্ধ পরগণা বরদাখাতের ॥০ আট আনা হিস্যার অন্তর্ভূত "তপে পাঁচ ভাগ"এর অধীন জোয়ার নন্দিপাড়ার অন্তর্গত। উক্ত জোয়ারের ৫টি গ্রামের মধ্যে নিজ নন্দিপাড়াই প্রকাশ্য চিনীশপুর বটে। সংলগ্ন টেঙ্গইরপাড়াও এই জোয়ার মধ্যে অবস্থিত। প্রবাদ অনুসারে, রামপ্রসাদ কৌলমার্গী চীনাচারের সাধক ছিলেন, তদনুসারে গ্রামের প্রকাশ্য নাম প্রচারিত হয়। কুমিল্লা কালেক্টরীর মহাফেজখানায় উক্ত পরগণার যে লাখেরাজ রেজেষ্টর রক্ষিত আছে (১৯৩৩ তৌজীর ৫নং বস্তা), তন্মধ্যে ১৮৩৯ সনের ফএছলায় পাওয়া যায়:—

৩৯নং—দেবত্র ৺কালীঠাকুরাণী: দখলকার শম্ভুনাথ, কালিদাষ, রাধানাথ ও লোকনাথ চক্রবর্ত্তী। মৌজে নন্দিপাড়া জমি বাজেআপ্তি ২৬৵১॥৴০ (প্রায় ৩ দ্রোণ)।

জনশ্রুতি অনুসারে মির্জা মাহাম্মদ ইব্রাহিম (বরদাখাত ষোল আনার জমীদার) এই দেবত্র প্রদান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (অনুমান ১৭৬৯ খ্রীঃ) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জাআলী ॥০ হিস্যার জমীদার ছিলেন। ১১৮৯ সনে (১৭৮২ খ্রীঃ) মির্জা আলীর মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নী ওজিয়ন্নিসাখানম ও জামাতা প্রসিদ্ধ মির আশ্রফ আলী (মৃত্যু, মার্চ ১৮৩১) জমীদারী ভোগ করেন। তৎকালে মির আশ্রফ আলীর কর্ম্মচারিগণকে বাধ্য করিয়া শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী সমস্ত দেবত্রভূমি নিজ নামে লেখাইয়া লইয়াছিলেন। ১২১১ সনে বর্ত্তমান ঢাকার নবাববংশের পূর্ব্বপুরুষ খাজে হাফেজউল্লা অনেক টাকা সেলামী দিয়া তপে পাঁচ ভাগ পত্তনী লইয়াছিলেন। ১২১২ সনের আষাঢ় মাসে রামপ্রসাদের দৌহিত্র শম্ভুচন্দ্র শ্রীনারায়ণের বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করিলে ঐ সনের ৩০ মাঘের হুকুমনামা দ্বারা শম্ভুচন্দ্র তান্ত্রিকসূত্রে অর্দ্ধাংশ এবং শ্রীনারায়ণের পুত্র বলরাম পূজকসত্বে অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হন।

রামপ্রসাদের সহচর: চিনীশপুরের অনতিদূরবর্ত্তী জিনার্দ্দী গ্রামের চক্রবর্ত্তিবংশে দুই জন সাধক রামপ্রসাদের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে একজনের নাম রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। তিনিও রামপ্রসাদের অনুকরণে গান রচনা করিতেন এবং

"দীন রামপ্রসাদ" ভণিতাযুক্ত তদীয় কোন কোন গান পদাবলীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তিনি রামপ্রসাদ অপেক্ষা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তদীয় পৌত্র কালীকুমার ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্যের চিত্রশিক্ষক ছিলেন।

উক্ত বংশের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক অক্ষয়রাম চক্রবর্ত্তীও রামপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। রামপ্রসাদের সংগৃহীত নিমকাঠ লইয়া তিনি কালীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন (আর্য্যদর্পণ, ১৩১৯, পৃ. ১৮৭)। তদুপরি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ষট্‌কোণ যন্ত্রাকৃতি কালীমন্দির ভগ্নাবস্থায় এখনও বিদ্যমান আছে। তিনি প্রথম জীবনে বরদাখাতের ৵১৩।/০ হিস্যার জমীদার বিখ্যাত শক্তিসাধক মির্জা হুসেন আলী (মৃত্যু, চৈত্র ১২৩০ সন) সাহেবের স্মারনবীশ ছিলেন। তিনি রমণার কালীবাড়ীতে হরচন্দ্র গিরির সহিত এক সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করেন। তাঁহার গুরুদত্ত নাম জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, কিন্তু জনশ্রুতি অনুসারে 'গুরুর ছলে' তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি "তত্ত্বপ্রকাশ" নামে একটি তান্ত্রিক নিবন্ধ ১৭৩০ শকে রচনা করেন।[১৬] মির্জা মাহাম্মদ ইব্রাহিম ১১৬৯ সনের ১৫ আষাঢ় তাঁহাকে ভূমিদান করেন। স্বয়ং মির্জা হুসেন আলী৺ ১২১০ সনের ২রা অগ্রহায়ণ জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তির সেবার্থ বৎসর ৯৮৲ টাকা দেবত্র করিয়া দেন। আমরা উভয় সনদ পরীক্ষা করিয়াছি।

দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনাবলী বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সংগ্রহ করার চেষ্টা কেহই করেন নাই এবং বর্ত্তমানে তাহা প্রায় সমস্ত চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। 'আর্য্য-দর্পণে'র প্রবন্ধ হইতে আমরা কতিপয় ছিন্ন তত্ত্ব এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ৺কৈলাস সিংহ দ্বিজ রামপ্রসাদকে "রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী" বলিয়া লিখিয়াছেন। স্থানীয় লোকে তাঁহাকে "পেহ্-ঠাকুর" বলিয়া ডাকিত (আর্য্যদর্পণ, ১৩১৯, পৃ. ১৮৭ ও ২৩২)। তদনুসারে "রামপ্রসাদ ঠাকুর"ই তাঁহার প্রচলিত নাম ধরা যায়। তিনি "নৈবেদ্য বাম হাতে লইয়া নিবেদনান্তে 'খা, খা' বলিয়া স্বয়ংই উদরস্থ করিতেন" (ঐ, পৃ. ২৩২)। তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে "বেড়া বাঁধা" ঘটনাই অতি প্রসিদ্ধ। রাজমোহন আম্বলীর তিনটি গানেই (৩২, ১১৫ ও ২৯২ সংখ্যক) বেড়া বান্ধার উল্লেখ আছে। আমরা একজন প্রাচীন গায়কের মুখে শুনিয়াছিলাম, জয়ন্তিয়া রাজবাড়ীতে বৃন্দাবনজীর মন্দিরমধ্যে শক্তিসঙ্গীত গাহিয়া তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

১৬। এই গ্রন্থের প্রথম "কল্প" মাত্র (৫ "বিরামে" বিভক্ত) আবিষ্কৃত হইয়াছে (পত্রসংখ্যা ৪৭)। গ্রন্থশেষ যথা (H. P. Sastri : *Notices*, Vol. I, p. 140-1)

> যত্রাণীযমুনাদিজাহ্নবীযুতং তীর্থং ত্রিশক্ত্যাত্মকং
> লৌহিত্যং খলু তস্য পশ্চিমতটে গ্রামে জিনার্দ্দ্যাখ্যকে।
> কালীমন্দিরসন্নিধৌ নিজপুরে বঙ্গে কুঞ্জে বাসরে
> ত্রিংশৎসপ্তবিধৌ শকে কৃত ইহ গ্রন্থো রবৌ কর্কটে॥

পদাবলী : বর্ত্তমানে রামপ্রসাদের যে সকল গান মুদ্রিত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রায় একতৃতীয়াংশ দ্বিজ রামপ্রসাদের রচিত হইবে। ১৫টি মাত্র পদে "দ্বিজ রামপ্রসাদে"র ভণিতা দেখিয়া অতুলবাবুর গ্রন্থে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (প্রসাদী-কথা, পৃ. ২৫৬-৫৭), তাহা পক্ষপাতদুষ্ট এবং প্রমাণবিরুদ্ধ। দয়াল ঘোষ যখন গান সংগ্রহ করেন, তখন সবগুলিই দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া তাঁহার সংস্কার ছিল। তাঁহার প্রথম সংগৃহীত ৫০টি গানের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারিত ছিল বলিয়া দ্বিজ রামপ্রসাদের রচনা হওয়াই সম্ভব। বর্ত্তমানে ভাষা ও সংগ্রহস্থানের সাবধান আলোচনা দ্বারা পদাবলীর বিভাগ দুরূহ হইলেও কর্ত্তব্য। তৎপূর্ব্বে উভয়ের তুলনা অসাধ্য এবং অনুচিত। গুপ্তকবির গবেষণার ফলে কবিরঞ্জনের কীর্ত্তি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। কবিরঞ্জন একাধারে সাধক, কবি এবং সঙ্গীতকার। সাধনা বিষয়ে উভয়ের তুলনা পাপজগতের অনধিকারচর্চ্চা। দ্বিজ রামপ্রসাদের গান ভিন্ন পৃথক্ কাব্য নাই। সুতরাং সঙ্গীত-রচয়িতারূপেই উভয়ের তুলনা করিতে হইবে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। নিরক্ষর নাবিক বাসি কাপড়ে যাঁহার গান গাইতে পরাঙ্মুখতা অবলম্বন করে, দয়াল ঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া অতুলবাবু পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁহার সাধন-সঙ্গীতে লঘুভাব, অনুকরণপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষ আবিষ্কার করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন এবং অপর কেহ কবিরঞ্জনেরও ব্যবসাদারী আবিষ্কার করিয়া সুখী হইয়াছেন। উভয়ই বিপথগামীর বিকার। আমরা বলি, কবিরঞ্জনের গান যেমন অপূর্ব্ব, তেমনই দ্বিজ রামপ্রসাদের গানও অপূর্ব্ব। উভয়ই সাধক, সমসাময়িক এবং স্ব স্ব ব্যবসায়ে প্রথম স্রষ্টিকর্ত্তা।

উপসংহারে দুইটি অপ্রকাশিত পদ মুদ্রিত হইল—কোন্ রামপ্রসাদের রচিত, পাঠকগণ নির্ণয় করুন।

আমার মোন কেন পায়াছ, এতো ভয় রে।
পথে জেতে চোকীদারে জদি কিছু কয় :
তবে পরিচয় দিয় কাইলা মাএয়ের তনয় রে।
তুফান দেখে ডৈর না মোন তুফান কিছু নয় :
শ্রীগুরু দিয়াছে তরি বাহিএ গেলে হয় রে।
প্রসাদ বোলে ঝড়ী তুফান দিবানিশি হয় :
হাইল আটে ধৈর মাঝি শ্রীগুরু সহায় রে॥

(রাজসাহী হইতে সংগৃহীত, ১২৩৫ সনে লিখিত একটি কুলপঞ্জীর পৃষ্ঠ পাইয়া 'যথাদৃষ্টং' মুদ্রিত হইল।)

তারা, আমার বৃথায় বৈয়া গেল দিন।
মনে ছিল সাদ করিতে সন্ন্যাস পৈরিতে ডোর কপিন :
কি মর দশার তরে পৈরি ভব ফেরে জালে বন্দি যেমন মিন।

মনে ছিল আশ করি কাশিবাস উদ্ধারিতে মায়ের রিণ :
দুরন্ত কপাল কি হৈল মায়াজাল
ঘোড়ার মোখে জেমুন জিন।
এ ভবে আশিয়া তোমা না ভজিয়া এমনি বহিল দিন :
মনে ছিল যত সব হইল হত বলে রামপ্রসাদ হিন ॥

(ত্রিপুরা জেলার এক গ্রাম হইতে প্রাপ্ত। ইহাও প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বের লেখা একটি পত্র হইতে অবিকল উদ্ধৃত।)

গ্রন্থপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

জন্ম : ইং ১৮৬৪ (?), মৃত্যু : ৪ জুলাই ১৯২৭।

ইং ১৮৯৪

১। **ফুল-শয্যা** (বিয়োগান্ত দৃশ্য কাব্য)। ইং ১৮৯৪ (২ মে)। পৃ. ১৮৯।

ইং ১৮৯৬

২। **প্রেমাঞ্জলি** (পৌরাণিক নাটক)। ইং ১৮৯৬ (১৮ জুলাই)। পৃ. ১৫৭।

৩। **কবি-কাননিকা** (রঙ্গন্যাস)। ১৩০৩ সাল। পৃ. ১৯৬।

ইং ১৮৯৭

৪। **আলিবাবা** (রঙ্গনাট্য)। ১৩০৪ সাল। পৃ. ১১০।...ক্লাসিক।

ইং ১৮৯৮

৫। **প্রমোদরঞ্জন** (রঙ্গনাট্য)। ১৩০৫ সাল (১৯ অক্টোবর)। পৃ. ১০২।...রয়েল বেঙ্গল, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮।

ইং ১৮৯৯

৬। **কুমারী** (নাট্যকাব্য)। ১৩০৫ সাল। পৃ. ৮০।...রয়েল বেঙ্গল, ২৪ পৌষ ১৩০৫।

ইং ১৯০০

৭। **জুলিয়া** (গীতিনাট্য)। ১৩০৬ সাল (২৪ জানুয়ারি)। পৃ. ১৫২।...মিনার্ভা, ১৬ পৌষ ১৩০৬।

৮। **বভ্রুবাহন** (নাট্যকাব্য)। ১৩০৬ সাল (২৫ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ১১৯।...রয়েল বেঙ্গল, ১০ ভাদ্র ১৩০৬।

ইহার দ্বিতীয় অভিনয় হয় ষ্টার থিয়েটারে 'উলূপী' নামে।

ইং ১৯০২

৯। **সাবিত্রী** (পৌরাণিক নাটক)। ১৩০৯ সাল (৪ অক্টোবর)। পৃ. ১৩৪।.. ষ্টার।

১০। **সপ্তম প্রতিমা** (নাটক)। ১৩০৯ সাল (১৩ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৫১।...ষ্টার। ৩ শ্রাবণ ১৩০৯।

ইং ১৯০৩

১১। **বেদৌরা** (গীতিনাট্য)। ইং ১৯০৩ (১৩ জানুয়ারি)। পৃ, ১৪০।…ষ্টার, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০২।

১২। বঙ্গের **প্রতাপ-আদিত্য** (ঐতিহাসিক নাটক)। ভাদ্র ১৩১০ (২৯ আগষ্ট)। পৃ. ১৮৪।.. ষ্টার, ১৫ আগষ্ট ১৯০৩।

শ্রীমন্মথমোহন বসু-লিখিত ভূমিকা সহ।

১৩। **রঘুবীর** (নাটক)। ১৩১০ সাল (১৮ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৭৪।…মিনার্ভা, ২১ কার্ত্তিক ১৩১০।

ইং ১৯০৪

১৪। **বৃন্দাবন-বিলাস** (গীতিনাট্য)। ২২ পৌষ ১৩১০ (৩১ জানুয়ারি)। পৃ. ৮৪।…ষ্টার।

১৫। **রঞ্জাবতী** (নাটক)। ১৩১১ সাল (৪ অক্টোবর)। পৃ. ১৮৬।…ষ্টার।

১৬। **নারায়ণী** (উপন্যাস)। অগ্রহায়ণ ১৩১১। পৃ. ৩৪৬।

এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড কার্ত্তিক ১৩১০—শ্রাবণ ১৩১১ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৯০৬

১৭। **উলূপী** (নাটক)। ১৩১৩ সাল (১৫ জুলাই)। পৃ. ১৪০।…ষ্টার।

১৮। **পদ্মিনী** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৩ সাল (১৫ নবেম্বর)। পৃ. ২০১+১।…ষ্টার।

ইং ১৯০৭

১৯। **পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৩ সাল (৫ জানুয়ারি)। পৃ. ২১৭।.. ষ্টার।

২০। **রক্ষঃ ও রমণী** (নাটক)। ১৩১৩ সাল (১০ জানুয়ারি)। পৃ. ৭৮।…ষ্টার।

২১। **চাঁদ বিবি** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৪ আগষ্ট)। পৃ. ১৮৮।…কোহিনূর, ২৬ শ্রাবণ ১৩১৪।

ইং ১৯০৮

২২। **নন্দকুমার** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৪ সাল (১ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ১৭৬।…ষ্টার।

২৩। **দাদা ও দিদি** (রঙ্গনাট্য)। ১৩১৪ সাল (৮ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ৫৫।…কোহিনূর।

২৪। **অশোক** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৫ জুন)। পৃ. ১৬৪।…কোহিনূর, ২৪ ফাল্গুন ১৩১৪।

২৫। **বাসন্তী** (গীতিনাট্য)। ১৩১৫ সাল (৫ জুলাই)। পৃ. ৪৮।…কোহিনূর, ২১ চৈত্র ১৩১৪।

২৬। **বরুণা** (গীতিনাট্য)। ১৩১৫ সাল (১০ জুলাই)। পৃ. ১২৭।…কোহিনূর, ২৭ আষাঢ় ১৩১৫।

২৭। **ভূতের বেগার** (রঙ্গনাট্য)। ১০ পৌষ ১৩১৫ (২৮ ডিসেম্বর)। পৃ. ৫৫।… কোহিনূর, ১০ পৌষ ১৩১৫।

ইং ১৯০৯

২৮। **দৌলতে দুনিয়া** (নাটক)। ১৩১৫ সাল (১৫ জানুয়ারি)। পৃ. ১৩৫।…কোহিনূর।

২৯। **বিরামকুঞ্জ** (গল্প-লহরী)। ? (২০ আগষ্ট ১৯০৯)। পৃ. ১২৬।

সূচী :—কর্ম্মফল, নির্ব্বাসিত, চিত্রদর্শন, "পো'দাদা", প্রায়শ্চিত্ত।

৩০। **দুর্গা** (পৌরাণিক আখ্যান)। ১৫ আশ্বিন ১৩১৬ (৯ অক্টোবর)। পৃ. ১২৮।

ইং ১৯১০

৩১। **বাঙ্গালার মসনদ** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৭ সাল (১৬ জুলাই)। পৃ. ১৫২।…মিনার্ভা।

ইং ১৯১১

৩২। **পলিন** (গীতিনাট্য)। ১৩১৭ সাল (২ মার্চ)। পৃ. ১০৭।…মিনার্ভা।

ইং ১৯১২

৩৩। **মিডিয়া** (কল্পনামূলক নাটক)। ১৩১৯ সাল (১৪ জুলাই)। পৃ. ১১৭।…মিনার্ভা, ২২ আষাঢ় ১৩১৯।

৩৪। **খাঁজাহান** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১৯ সাল (২৫ জুলাই)। পৃ. ১৪০।… কোহিনূর।

৩৫। **পুনরাগমন** (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩১৯ সাল (২৮ অক্টোবর)। পৃ. ৩৫৫।

ইং ১৯১৩

৩৬। **ভীষ্ম** (পৌরাণিক নাটক)। ১৩২০ সাল (১৫ জুন)। পৃ. ১৩২।

৩৭। **রূপের ডালি** (রঙ্গনাট্য)। ? (২৩ অক্টোবর)। পৃ. ১৩১।…মিনার্ভা, ৪ আশ্বিন ১৩২০।

ইং ১৯১৪

৩৮। **নিয়তি** (নাটিকা)। ১৩২০ সাল (৯ এপ্রিল)। পৃ. ১১৫।…মিনার্ভা, ৭ চৈত্র ১৩২০।

ইং ১৯১৫

৩৯। **আহেরিয়া** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩২১ সাল (২০ জানুয়ারি)। পৃ. ১৭১। ...মিনার্ভা, ১১ পৌষ ১৩২১।

৪০। **বাদ্‌শাজাদী** (কল্পনামূলক নাটক)। ১৩২২ সাল (৩১ ডিসেম্বর)। পৃ. ১৫৬। ...মনোমোহন, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২২।

ইং ১৯১৬

৪১। **রামানুজ** (ধর্ম্মমূলক নাটক)। ১৩২৩ সাল (৩০ জুলাই)। পৃ. ২০৮।

ইং ১৯১৭

৪২। **বঙ্গে রাঠোর** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (৮ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৮৮।...মিনার্ভা, ২৩ ভাদ্র ১৩২৪।

ইং ১৯১৮

৪৩। **কিন্নরী** (গীতি-নাট্য)। ? (১৭ আগস্ট ১৯১৮)। পৃ. ১৩৯।...মিনার্ভা, ৩২ শ্রাবণ ১৩২৫।

ইং ১৯১৯

৪৪। **নিবেদিতা** (উপন্যাস)। ১১ মাঘ ১৩২৫ (৩ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ৪৩১।

ইং ১৯২০

৪৫। **গুহামুখে** (উপন্যাস)। পৌষ ১৩২৬ সাল (১২ জানুয়ারি)। পৃ. ২৪৬।

ইং ১৯২১

৪৬। **মন্দাকিনী** (পৌরাণিক নাটক)। ১৩২৮ সাল (১৪ এপ্রিল)। পৃ. ১০০।...ষ্টার, ২০ চৈত্র ১৩২৭।

৪৭। **আলমগীর্** (ঐতিহাসিক নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩২৮ (৯ ডিসেম্বর)। পৃ. ২৬০। ...কর্ণওয়ালিস, ১০ ডিসেম্বর ১৯২১।

ইং ১৯২২

৪৮। **রত্নেশ্বরের মন্দিরে** (নাটক)। ? (২৮ ডিসেম্বর ১৯২২)। পৃ. ১১২।... কর্ণওয়ালিস, ২৩ ডিসেম্বর ১৯২২।

ইং ১৯২৩

৪৯। **বিদূরথ** (ঐতিহাসিক নাটক)। ফাল্গুন ১৩২৯ (১০ মার্চ)। পৃ. ১৫৭।.. বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোং, আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে, ১০ মার্চ ১৯২৩।

৫০। **গুহামধ্যে** (উপন্যাস)। শ্রাবণ ১৩৩০ সাল (২৯ জুলাই)। পৃ. ১০৯।

ইং ১৯২৪

৫১। **পতিতার সিদ্ধি** (উপন্যাস)। মাঘ ১৩৩০ সাল (২০ মার্চ)। পৃ. ৩২২।

৫২। **চাঁদের আলো** (উপন্যাস)। ? (১৯২৪ ?)। পৃ. ১৯১।

ইং ১৯২৫

৫৩। **গোলকুণ্ডা** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৫)। পৃ. ১৫৬।… আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫।

ইং ১৯২৬

৫৪। **জয়শ্রী** (নাটক)। ? (২০ ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ১৫১।…মিত্র থিয়েটার, ১ শ্রাবণ ১৩৩৩।

৫৫। **রাধা-কৃষ্ণ** (গীতি নাট্য)। ?। পৃ. ৪৮।…নাট্যমন্দির, ১৩ ভাদ্র ১৩৩৩।
"বৃন্দাবন-বিলাস হইতে গৃহীত।"

৫৬। **নর-নারায়ণ** (পৌরাণিক নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩। পৃ. ২০১।…নাট্য-মন্দির, ১ ডিসেম্বর ১৯২৬।

সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত রচনা

ক্ষীরোদপ্রসাদের কিছু কিছু রচনা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; এগুলি সংগৃহীত হওয়া উচিত। তাঁহার কয়েকটি রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব… চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান ও সমীরণ', ১৩০০, ১ম-৩য় সংখ্যা।
শম্ভু সংবাদ…　　　ঐ,　　১৩০২, বৈশাখ—আষাঢ়।
জন্মভূমি (কবিতা)‥ 'জন্মভূমি', ১৩০১ ভাদ্র।
নাটক…'জন্মভূমি', ভাদ্র ১৩০২।
দধীচির অস্থিদান (কবিতা)…'জাহ্নবী', কার্ত্তিক ১৩১১।
শিরী-ফরীদ…'ভারতী', বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩১৩।
রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি…'নাট্য-মন্দির', শ্রাবণ ১৩১৭।
আমি ও তুমি (কবিতা)…'ভারতবর্ষ', কার্ত্তিক ১৩২০।
ফুলী (গল্প)…'বার্ষিক বসুমতী', ১৩৩৪।

'দধীচির অস্থিদান' কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১)

পার হ'য়ে গেল সূর্য্য পশ্চিম আকাশ,
জাহ্নবী কাঁদিল মৃদুস্বরে;
ভাঙে ব্রত, বৃদ্ধ ঋষি হইল নিরাশ—
অতিথি এল না বুঝি ঘরে!

(২)

একটি মেঘের শিশু প্রশান্ত সাগরে
মাথা তুলি স্থিরনেত্রে চায়,
"এ দরিদ্রে ঋষিরাজ দেখ দয়া করে
ক্ষুধানলে বুক জ্বলে যায়।"

(৩)

"আয় বাপ কি চাহিবি, তোরে দিব দান,"
ডাকে ঋষি বাহু প্রসারিয়া ;
বেদমন্ত্রে করে তার আবাহন গান
ধ্যানে বসে নয়ন মুদিয়া।

(৪)

পলকে প্রলয় এল যুগ এল পলে !
কে কাঁদে রে সকরুণ স্বরে ?
"স্থান দাও হে ব্রাহ্মণ চরণকমলে
অতিথি দাঁড়ায়ে তব দ্বারে।"

(৫)

চেয়ে দেখে ঋষিরাজ অস্থিচর্ম্মসার
উপবাসী মূর্ত্তি তপস্যার—
কে অতিথি নতজানু দেবতা আকার
সহস্র লোচনে বহে ধার ?

(৬)

"অসুরের পদভরে কাঁপে জন্মভূমি
পলায়িত দেবতাবাহিনী।
ভিক্ষা আশে তব দ্বারে আসিয়াছি আমি
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও মুনি।"

(৭)

"হে পুণ্য অতিথি এস, পাতহ অঞ্জলি
ব্রত আজ করি উদ্‌যাপন।
বুক চিঁড়ি হে ভিখারী লহ অস্থি তুলি
ক্ষুধা তৃষ্ণা কর নিবারণ।"

(৮)

ক্ষুদ্র সে জলদশিশু হইল বিপুল
গগনে ছুটিয়া গেল ঝড় ;
নিমেষে দানবশক্তি হইল নির্ম্মূল
আকাশ করিল কড় কড়।

(৯)

ক্ষীর নীর মাতৃবক্ষে ঢালে জলধর,
জননীর তৃষ্ণা গেল দূরে ;
দধীচির জয়গান গাহিল অমর
এ কি ভিক্ষা দিলে জননীরে।

মাসিক-পত্র সম্পাদন

ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'অলৌকিক রহস্য' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার অনেক রচনা স্থান পাইয়াছিল। পত্রিকাখানি অনিয়মিত ভাবে ছয় বৎসর চলিয়াছিল। আমরা ইহার ৬ষ্ঠ বৎসরের চতুর্থ সংখ্যা (ভাদ্র ১৩২২) পর্য্যন্ত দেখিয়াছি।

হৈহয়কুলের শার্য্যাত-শাখা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

হৈহয়েরা সুবিখ্যাত যদুবংশের শাখা। কালক্রমে তাহারা পাঁচটি উপশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। পার্জিটার সাহেব লিখিয়াছেন যে, হৈহয়-বংশের এই পঞ্চ উপশাখার নাম—বীতিহোত্র, শার্য্যাত, ভোজ, অবন্তি এবং তুণ্ডিকের। তাঁহার মতে, এই উপশাখাগুলির সাধারণ নাম ছিল—তালজঙ্ঘ। প্রকৃতপক্ষে পার্জিটারের মত ভ্রমাত্মক। মূল পুরাণগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হৈহয়-বংশের শার্য্যাতসংজ্ঞক কোন উপশাখা ছিল না। উল্লিখিত পঞ্চ উপশাখার বিবরণ মৎস্যপুরাণ (৪৩।৪৮-৪৯), বায়ুপুরাণ (৯৪।৫১-৫২), ব্রহ্মপুরাণ (১৩।২০৩-৪), পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড, ১২।১৩৫-৩৬), হরিবংশ (১।৩৩।৫১-৫২) প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মৎস্যপুরাণের বিবরণটি উদ্ধৃত করিব; কারণ, ইহা হইতেই পার্জিটার শার্য্যাত উপশাখার নাম পাইয়াছেন।

মৎস্যপুরাণকার বলিয়াছেন :—

> তেষাং পঞ্চ কুলাঃ খ্যাতা হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্।
> বীতিহোত্রাশ্চ শার্য্যাতা ভোজাশ্চাবন্তয়স্তথা॥
> কুন্তিকেরাশ্চ বিক্রান্তাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ॥

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলির ভাষা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, হৈহয়দিগের পঞ্চ উপশাখার অন্যতমের নাম ছিল—তালজঙ্ঘ। পার্জিটার যে বলিয়াছেন, তালজঙ্ঘ পাঁচটি উপশাখার সাধারণ নাম ছিল, তাহা সত্য নহে। তাহা হইলে, উপশাখার সংখ্যা পাঁচটি বলিয়া উল্লিখিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ছয়টি নাম পাইতেছি—বীতিহোত্র, শার্য্যাত, ভোজ, অবন্তি, কুন্তিকের (শুদ্ধ পাঠ—তুণ্ডিকের) এবং তালজঙ্ঘ। এই অসামঞ্জস্যের সমাধান করিতে হইলে মৎস্যপুরাণের বিবরণে কোন ভুল আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্য কোন বিবরণেই শার্য্যাত উপশাখার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বায়ুপুরাণের মতে—

> তেষাং পঞ্চ গণাঃ খ্যাতা হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্।
> বীরহোত্রা সুসংখ্যাতা ভোজাশ্চাবর্ত্তয়স্তথা॥
> তুণ্ডিকেরাশ্চ বিক্রান্তাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ॥

ব্রহ্মপুরাণের মতে—

> তেষাং কুলে মুনিশ্রেষ্ঠা হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্।
> বীতিহোত্রাঃ সুব্রতাশ্চ ভোজাশ্চাবন্তয়ঃ স্মৃতাঃ॥
> তৌণ্ডিকেরাশ্চ বিখ্যাতাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ॥

পদ্মপুরাণের মতে—

> তেষাং পঞ্চ কুলাস্ত্বাসন্ হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্।
> বীতিহোত্রাশ্চ সঞ্জাতা ভোজাশ্চাবন্তয়স্তথা॥
> তুণ্ডকেরাশ্চ বিক্রান্তাস্তালজঙ্ঘাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

হরিবংশের মতে—

তেষাং কুলে মহারাজ হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্‌।
বীতিহোত্রাঃ সুজাতাশ্চ ভোজাশ্চাবন্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
তৌণ্ডিকেরা ইতি খ্যাতাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ॥

বিভিন্ন পুরাণের পাঠ আলোচনা করিলে দেখা যায়, মৎস্যপুরাণের "শার্য্যাতাঃ" স্থলে পুরাণান্তরের পাঠ—[অ] সংখ্যাতাঃ, সুব্রতাঃ, সঞ্জাতাঃ, সুজাতাঃ, ইত্যাদি। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে "বিক্রান্তাঃ" বা "বিখ্যাতাঃ" যেমন একটি বিশেষণ শব্দ, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতেও তদনুরূপ একটি বিশেষণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য অসংখ্যাতাঃ, সুব্রতাঃ, সঞ্জাতাঃ এবং সুজাতাঃ, এই চারিটি শব্দের মধ্যে কোন্‌ বিশেষণটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক এবং মৌলিক, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে বিভিন্ন পুরাণের বিবরণে যে একই মূল পাঠ অথবা উহার অনুকৃতির অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, বায়ুপুরাণের "অসংখ্যাতাঃ" বিশেষণটি মৌলিক। পাজ্জিটার সাহেব নিজেই দেখাইয়াছেন যে, বায়ুপুরাণ অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ। আবার ভারতের প্রাচীন সাহিত্য এবং ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, সে কালে ভোজবংশীয়েরা সত্যই "অসংখ্যাত" অর্থাৎ অসংখ্য ছিলেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৮।১৪) অনুসারে সাত্বৎদিগের রাজগণ ভোজসংজ্ঞা লাভ করিতেন এবং তাঁহারা মধ্যদেশের দক্ষিণ দিকে রাজত্ব করিতেন। কালিদাস (রঘুবংশ।৫।৩৯-৪০) বিদর্ভদেশ অর্থাৎ বেরারের নরপতিকে ভোজবংশীয়রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালের বাকাটক-বংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনেও বেরারের অন্তর্গত ভোজকট রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (১।৬) হইতে দণ্ডক অর্থাৎ মহারাষ্ট্র অঞ্চলের জনৈক নরপতির ভোজসংজ্ঞা দেখিতে পাই। অশোকের অনুশাসনে এবং খারবেলের হাতীগুম্ফালিপিতে যে ভাবে ভোজদিগের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারি, ভোজবংশীয়েরা দীর্ঘকাল মহাপরাক্রমে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, ভোজগণ ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং একাধিক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং ভোজদিগকে অসংখ্য বলিয়া বর্ণনা করা অস্বাভাবিক নহে। আমাদের বিবেচনায়, পূর্ব্বোদ্ধৃত পৌরাণিক বিবরণের মৌলিক বিশুদ্ধ পাঠ অনেকটা এইরূপ—

তেষাং পঞ্চ গণাঃ খ্যাতা হৈহয়ানাং মহাত্মনাম্‌।
বীতিহোত্রা অসংখ্যাতা ভোজাশ্চাবন্তয়স্তথা।
তুণ্ডিকেরাশ্চ বিক্রান্তাস্তালজঙ্ঘাস্তথৈব চ।

অতএব, প্রাচীন হৈহয়কুলের পঞ্চ উপশাখার নাম—বীতিহোত্র, ভোজ, অবন্তি, তুণ্ডিকের এবং তালজঙ্ঘ। হৈহয়বংশের শার্য্যাতসংজ্ঞক কোন উপশাখা ছিল না। মৎস্যপুরাণের "শার্য্যাতাঃ" শব্দটি মৌলিক শুদ্ধ পাঠ নহে।

অনুবাদাত্মক সমাস

শ্রীপ্রণবেশ সিংহ রায়

কোন দেশে যখন বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়ে এবং কালক্রমে তাহারা তথায় মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে থাকে, তখন জাতিগত বা রক্তের সংমিশ্রণের সহিত সংস্কৃতি তথা ভাষাগত মিশ্রণও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। পৃথিবীর যে যে দেশেই এইরূপ একভাষাভাষীর সহিত অপরভাষাভাষীর সংঘর্ষ ও পরিশেষে মিলন ঘটিয়াছে, সেই সেই দেশেই দুই বা ততোধিক ভাষার ছাপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষে আর্য্যবিজয়ের কাল হইতে এইরূপ ভাষাগত সংমিশ্রণ চলিয়া আসিতেছে। কালক্রমে দেশী ভাষাগুলি আর্য্যদের ভাষার সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। অবশ্য অল্পসংখ্যক স্বাধীনতাপ্রিয় বশ্যতাস্বীকারপরাঙ্মুখ আর্য্যেতর জাতি অদ্যাপি দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে জাতি ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া অবস্থান করিতেছে। কিন্তু মোটামুটি দেশশুদ্ধ অনার্য্যভাষাভাষিগণ যখন আর্য্যের ভাষাই গ্রহণ করিতেছিল, তখনকার পরিস্থিতি সহজেই অনুমেয়। দেশে দ্বৈভাষিক অবস্থা ঘুচিতে বেশ কিছু সময় লাগিয়াছিল। ভাষার দ্বন্দ্ব কাটিয়া গিয়া কখন যে বৈদেশিক আর্য্যভাষাই পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল, তাহা কোন বিশেষ তারিখের মাপকাঠিতে নিশ্চিত বলা সম্ভবপর নহে। এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, একটি সম্পূর্ণ নূতন গোষ্ঠীর ভাষা গৃহীত হইতেছিল। তাহার মালমশলা ও গঠনপ্রণালী দেশপ্রচলিত ভাষা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। ভাষাটির শব্দসম্পদ্‌ও ছিল প্রচুর ও জটিল। এক কথায় তাহার ধরণই ছিল আলাহিদা ও তাহা আদৌ সহজবোধ্য ছিল না। দেশীভাষাগুলির তুলনায় সেই অভিনব ও বিশেষ আয়াসসাধ্য ভাষার শিক্ষানবিশী করিতে দেশবাসীদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল বলিলে অনুমান বৃথা হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে দেশবাসীরা যে তাহাদের সহজ সরল অতিপরিচিত আবাল্যলব্ধ জন্মগত মাতৃভাষার সাহায্যেই বিদেশী ভাষাটি আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইবে, তাহা একান্তই স্বাভাবিক। তার পর দেশপ্রকৃতিগত যাহা কিছু—বিশেষ বিশেষ দেশজ জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, আচার অনুষ্ঠান, স্থানীয় নাম ইত্যাদি সংক্রান্ত শব্দ যাহা নবাগত আর্য্যদের অভিধানে থাকিবার কথা নহে, সে সব বুঝাইতে নবার্জ্জিত ভাষাটির উপাদানে নূতন নূতন শব্দ গঠন করা এরূপ অবস্থায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এরূপ স্থলে স্বভাবতই খাঁটি দেশী শব্দগুলিই হুবহু বা ঈষৎ বিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হইত। বহু স্থলে দেবভাষা আর্য্যভাষার গৌরব ও মর্য্যাদা যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, সে জন্য অপাঙ্‌ক্তেয় দেশী শব্দের উপর সংস্কৃতের ধাতুগত রঙচঙ ঢালিয়া বর্ণচোরা শব্দ খাড়া করা হইত। রূপান্তরিত এই সকল শব্দের ঠাট দেখিয়া তাহারা যে নকল সংস্কৃত শব্দ, সাধারণে তাহা ধরিতে পারিত না। বর্ত্তমানে বিশেষজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা দেশী ভাষার গঠনরীতি পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ বহু ভোল-ফেরা শব্দ যে দেশীভাষা হইতে আগত, তাহা প্রমাণিত করিতেছেন। আবার ক্ষেত্র-

বিশেষে এমনও দেখা যায় যে, আর্য্যদের ভাষায় কোন সংজ্ঞা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও (যাহা আলোচ্য বস্তু বা ভাব অনেকাংশে প্রকাশ করে) অপেক্ষাকৃত সহজ, তদর্থপ্রকাশক দেশী শব্দটিও ভাষায় চালু রহিয়াছে। প্রথমোক্ত শব্দটির টীকা হিসাবে শেষোক্ত শব্দটি বহু স্থলে আগে বা পিছে বসিয়া উভয়ের সমন্বয়ে যেন একটি যৌগিক শব্দ গঠন করিয়াছে। এখানে পুনরুক্তি-দোষের কথাই উঠে নাই; একটি নূতন ও দুর্ব্বোধ্য আর্য্যভাষার শব্দের সহিত সুপরিচিত ও সমার্থক মাতৃভাষার শব্দটি যোগ করিয়া ভাষাশিক্ষার শব্দসাধন সুগম করা হইয়াছিল। কদাচিৎ এই শ্রেণীর শব্দের মৌলিকত্ব বৈয়াকরণপ্রসাদে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, শব্দটিকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া তাহার দ্বৈতভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রশ্নই মনে জাগে না—শব্দটিকে সর্ব্বতোভাবে আমরা অবিভাজ্যই জানিয়া আসিতেছি। আর্য্যভাষার উপর এই যে দেশী ভাষার প্রভাব, ইহা ইদানীং শনৈঃ শনৈঃ প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইতেছে। ধ্বনি-সমষ্টি, শব্দাবলী ও বাক্যবিন্যাস, সকল দিক্ দিয়াই ভারতীয় ভাষাগুলি দেশী ভাষার স্পর্শ এড়াইয়া চলিতে পারে নাই। তন্মধ্যে শব্দ গঠনের একটি দিক্ লইয়া আমাদের বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের সূত্রপাত। সেই দিক্ হইতেছে—কেমন করিয়া ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর দুইটি সমার্থদ্যোতক শব্দ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া একীভূত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার যুগ হইতে মধ্যভারতীয় আর্য্যভাষার ভিতর দিয়া উপর্য্যুক্ত প্রণালীর শব্দ সৃজন নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষায় চালু রহিয়াছে। আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষায় আবার* ফার্সী, ইংরাজি, পোর্ত্তুগীস্ ইত্যাদি বিদেশীয় ভাষা হইতে আগত শব্দ প্রবেশ করিয়া আলোচ্য শব্দের সংখ্যা বাড়াইতেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে অনুবাদাত্মক সমাস নামে অভিহিত করিয়াছেন; কেন না, এ স্থলে একটি শব্দ অপর শব্দের অর্থ যেন তর্জ্জমা করিয়া বুঝাইয়া দেয়। নিম্নে বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর কিছু শব্দ সংগ্রহ করিয়া উপস্থাপিত করা হইল। লোকমুখে সুপ্রচলিত ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত অনুবাদাত্মক সমাসগুলি ছাড়া কতিপয় এরূপ শব্দও এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে, যেগুলি আজিও সঠিক অনুবাদাত্মক সমাসের পর্য্যায়ে উঠে নাই, তবে উঠিবার সম্ভাবনা আছে বা যেগুলি কথঞ্চিৎ ব্যক্তিবিশেষগত বা সমাজ ও উপভাষাবিশেষগত, আশা করি, সেগুলি গ্রহণযোগ্য হইবে। স্থলবিশেষে অনুকার শব্দ ও যথায় শব্দের একটি উপাদান অপরটির আভাস বা ব্যঞ্জনামাত্র দিতেছে, তাহাও উদাহরণস্বরূপ তালিকায় অঙ্গীভূত করা হইয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি সম্ভাবনার সীমা অতিক্রম করা হয় নাই। অধুনা স্বীকৃত কতিপয় অনার্য্যভাষার শব্দ, যাহা প্রাচীন ও মধ্য-ভারতীয় আর্য্যভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষা উত্তরাধিকার

---

* আরবী, তুর্কী ভাষার শব্দাবলী তত্তৎভাষা হইতে সরাসরি বাঙ্গালায় আইসে নাই বলিয়া সেগুলি ফার্সী বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। পোর্ত্তুগীজ, ফরাসী ইত্যাদি পাশ্চাত্য ভাষা হইতে প্রাপ্ত শব্দের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ও তাহাদের মূল লইয়া অল্পবিস্তর মতদ্বৈত আছে; অপর পক্ষে ইংরাজী ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ কার্য্যগতিকে বাড়িয়াই চলিতেছে। অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষা হইতে গৃহীত শব্দ দ্বারা সৃষ্ট কোন অনুবাদাত্মক সমাসের উদাহরণ নজরে পড়ে নাই।

সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেগুলিকে দেশী শব্দ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় ভাষার নিজস্ব সম্পদ্ বলিয়া প্রতীয়মান কয়েকটি বিদেশী শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হয় নাই; যথা, 'ধীরেসুস্থে' শব্দটির 'সুস্থ' অংশের মূল হইতেছে ফার্সী 'সুস্ত'—অলস। এ ক্ষেত্রে ব্যাকরণের সাদৃশ্যগত প্রক্রিয়া কার্য্যকরী হইয়াছে। এখানে আর একটি কথার উল্লেখ করা দরকার। চীনাভাষার "সহকারী" শব্দের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় 'পত্র', 'পাত', পাতি, পাট ইত্যাদি কতগুলি শব্দ বহু স্থলে অপর শব্দে সংযুক্ত হইয়া ভাববিশেষ প্রকাশে সহায়তা করে। আমাদের তালিকায় এই ধরণের শব্দগুলি তারকাচিহ্নিত করা হইয়াছে। স্ত্রীসমাজে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দ যাহার চলন প্রকাশ্য ক্ষেত্রে নাই বলিলেই হয়, উদাহরণস্বরূপ সেগুলিকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে।

১। যে ক্ষেত্রে অনুবাদাত্মক সমাসের উভয় উপাদানই ভারতীয় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে পড়ে :—

(ক) তদ্ভব+তদ্ভব। যথা :— আলোবাতি, সইসাঙ্গাতি, সাধইচ্ছা, বামুনপুরুৎ, পূজারী বামুন, বাঁধাবন্ধক, কাদামাটি, শিকলবেড়ী, ঘাফোড়া, কাটাছেড়া, কেওকেটা, বাঁধাধরা, ধরে-বেঁধে, সাজপোষাক, দাদেইজি, জ্বাজাউলি, মাতালভাঙ্গড়, জ্ঞানবিৎ, রুখুসুখু, গাইবলদ, নাচাকোঁদা, মাজাঘষা, তেড়াবাঁকা, বাঁকাচোরা, মারধর, মারকাট, মেলামেশা, ভরপূর, বাজনাবাদ্য, নাতিপুতি, নাতিনাতকুড়, জ্ঞাতগুষ্টি, ছারখার, পাঁজিপুথি, ডোরসুতা, কাঁসা-পিতল, কাছেপিঠে, খেতভূঁই, গাঁজাভাঙ্গ, সোনাগাঁথা, চুরিচামারি, চেনাশোনা, চুরিবাটপাড়ি, চালচলন, জানাশোনা, যাগযোগ, টাকাপয়সা, থিতভিত, ধারদেনা, নীতকিত, পাড়াগাঁ, বাজিবাজনা, বাড়ীঘর, বাড়বাড়ন্ত, ভাগবাঁটোয়ারা, ভজনপূজন, ভজনসাধন, ভরাভর্ত্তি, ভাইভায়াদ, ক্ষেপাবাউল, নামডাক পসার, নাওয়াধোওয়া, চানধান, কাঁকরবালি।

(খ) তদ্ভব+তৎসম। যথা :— কাজকর্ম্ম, সঙ্গীসাথী, ছলচাতুরী, জাড়েশীতে, কানকর্ণ, সহসামাই, জ্বরজাড়ি, বামুন পুরোহিত, ঠাঁইআশ্রয়, ধূলাবালি, জ্ঞানীমানী, ভয়তরাস, সোহাগ-যত্ন, যত্নআত্যি, মামোতাল, চেনাপরিচয়, কলকৌশল, পসার প্রতিপত্তি, দে দেবতা, দেখা সাক্ষাৎ, দিনদুপুর, সাজসজ্জা, বিদেশবিভূঁই, রাজারাজড়া, লতাপাত, শাকপাত, শ্রীছাঁদ, স্নেহভালবাসা, স্নেহমমতা, ছলছুতা, কাপাসতুলা, দেশগাঁ, মাথামতি, জনমানুষ, মায়ামমতা, আদরসোহাগ, যোগাড়যন্ত্র, শিষ্যচেলা, গোছব্যবস্থা, নিষেধমানা, পরপরেয়া, ঘরনীগৃহিণী, যত্নসোহাগ, যাগযজ্ঞ, থিতব্যবস্থা, দীনভিখারী, দেশেগাঁয়ে, ফুর্ত্তিআমোদ, ভিতপত্তন, সাত্রীপাহারা, সন্ধানসুলুক, সুবাদসম্বন্ধ, ঘড়াকলসী, ভূষাকালি, পাখীপক্ষী, লাজলজ্জা।

(গ) তদ্ভব+অর্দ্ধতৎসম। যথা :— ছিরিছাঁদ, গা গতর, তিতিবেরক্ত, আপ্তগরজে, আপ্তকুটুম, পুকুরপুষ্করণী, বাড়াবাড়ি, আদিখ্যেতা, বামুনবোষ্টম।

(ঘ) তদ্ভব+দেশী। যথা :—ঘরবাড়ী, তেতেপুড়ে, বেটাপুত, চৈতনচুটকী, টানা-হেঁচড়া, রোগাপটকা, ছালচামড়া, আঁৎপোঁটা, পিঠাপুলি, মাথামুণ্ড, মাথামোড়, মারপিট, পুঁজিপাটা, ঘাচোট, শিকনিপোঁটা, ন্যাঙটকপ্নি, আঁকচেরা, বাসাবাড়ী, মাপজোক, গোবরনাদ,

কাঁটাবঁড়শী, কাঁটাঘোঁচা, মরাহাজা, আল্লাঢিলা, কাদাকিচড়, খেতখামার, মাঠখেত, ক্ষেপাপাগল, গাছপালা, ডালপালা, গল্পগাছা, শামুকগেঁড়ি, গেরোফাঁড়া, লগাষি (লগা+আঁকষি), ছাঁটকাট, নিধাওনিডুবি, ভাঙ্গাফুটা, দৌড়ধাপ, ধরপাকড়, সাজগোজ, হাঁচিকাশি, হাড়পাঁজড়া, ন্যালা-ক্ষেপা, বুড়াহা(ব)ড়া, ঘোরাফেরা, বলাকওয়া, ধরাছোঁয়া, বুড়োধাড়ি, লেখাজোকা, লোহালক্কড়, হাসিঠাট্টা, হাউড়ক্ষেপা, পাকতুড়ো, সেয়নাচড়কো, জ্বালাতনপোড়াতন, জ্বলেপুড়ে, লাঠিডাণ্ডা, ভালচার্জা, ডাবনারকেল, দোষঘাট, খাটপালঙ্ক, খুঁজেপেতে, পুরিয়ামোড়ক, পাকাঝুনো, আঁচলখুঁট, ইটপাটকেল, এড়াবাসি, এলাকাড়ি (আলাকাড়ি), কানাকুরুটে, কুষ্টিঠিকুজী, ক্ষুদকুঁড়া, গুগোবর, গড়ালুটি, ঘষডান, চুরিডাকাতি, চোরছেঁচড়, চোরডাকাত, চেয়েপেতে, চেয়েচিন্তে, ছাইপাঁশ, ছুতানাতা, যোগাড়পত্র,* টাকাকড়ি, টুটাফুটা, টাঁইসশাসন, ঠাঁইঠিকানা, ঠিকুরবোদ, ঠগজুয়াচোর, ডোরকপ্নি, পয়সাকড়ি, বেঁটেখেটে, ভিটামাটি, মিশালভেজাল, ভাঁড়কুঁড়, মিলজুল, সরমাটা, হেলাফেলা, ফোড়াফুস্কুড়ি, ধুমন্যাংটা।

(ঙ) তৎসম+তৎসম। যথা :—সভাসমিতি, আত্মীয়স্বজন, রীতিনীতি, অনুনয়বিনয়, সন্তানসন্ততি, সাধুসন্ন্যাসী, সুযোগসুবিধা, উপায়উপার্জ্জন, মনমতি, কথাবার্ত্তা, আভাসইঙ্গিত, ভব্যসভ্য, ভয়ভাবনা, বাগ্‌বিতণ্ডা, আপদ্‌বিপদ্, ব্রাহ্মণপুরোহিত, শিষ্যযজমান, প্রভাবপ্রতিপত্তি, হিংসাদ্বেষ, বিন্দুবিসর্গ, শূরবীর, দুঃখকষ্ট, ভয়ত্রাস, স্বভাবচরিত্র, ইষ্টবন্ধু, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়বন্ধু, আদরযত্ন, আদরআপ্যায়ন, গর্ব্বঅহঙ্কার, আদরঅভ্যর্থনা, আলাপআলোচনা, আলাপপরিচয়, রুক্ষশুষ্ক, বাদবিসম্বাদ, বিবাদবিসম্বাদ, গ্রামবসতি, জ্ঞানবুদ্ধি, মানসম্ভ্রম, ত্রস্তব্যস্ত, সাধঅভিলাষ, আচারব্যবহার, ছলাকলা, জীবজন্তু, জনমানব, জনপ্রাণী, জাতজন্ম, ত্রুটিবিচ্যুতি, দোষত্রুটি স্খলনবিচ্যুতি, নর্ত্তনকুর্দ্দন, দুঃখদুর্দ্দশা, দুঃখদৈন্য, অভাবঅনটন, দয়ামায়া, দোষঅপরাধ, দুঃখশোক, শোকতাপ, দয়াদাক্ষিণ্য, অস্থিপঞ্জর, বেশভূষা, পালনপোষণ, লালনপালন, লালিত-পালিত, ভরণপোষণ, শৌর্য্যবীর্য্য, বাধাবিপত্তি, বাধাবিঘ্ন, বিলাসব্যসন, জীর্ণশীর্ণ, ব্যস্তসমস্ত, ভাবনাচিন্তা, ভূতপ্রেত, ভোগবিলাস, ধনৈশ্বর্য্য, ক্রিয়াকলাপ, ক্রিয়াকাণ্ড, ব্যথাবেদনা, লোকজন, লণ্ডভণ্ড, বাসনাকামনা, সাধবাসনা, ভীতচকিত, পরিস্কারপরিচ্ছন্ন, জনসাধারণ, সাধআহ্লাদ, সেবাযত্ন, সেবাশুশ্রূষা, আমোদআহ্লাদ, আমোদপ্রমোদ, ঈর্ষাদ্বেষ, সারনিষ্কর্ষ, অস্ত্রশস্ত্র, অল্পস্বল্প, ছলকপট, পূজাপার্ব্বণ, মুনিঋষি, ইষ্টকুটুম্ব, চীরবাস, লতাগুল্ম, আত্মীয়কুটুম্ব, বিদ্বান্‌পণ্ডিত, কলহবিবাদ, টীকাটিপ্পনী, অজ্ঞানঅচৈতন্য, দৈত্যদানব, আধিব্যাধি, দীনহীন, আশাভরসা, কীটপতঙ্গ, কৃতকৃতার্থ, গ্রহনক্ষত্র, জ্ঞানীমানী, গণ্যমান্য, ছিন্নভিন্ন, জলবৃষ্টি, যুক্তিপরামর্শ, দ্বন্দ্বকলহ, ঝঞ্ঝাঝটিকা, তপতপস্যা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, তটবেলা, তর্কবিতর্ক, দিনকাল, দীনদরিদ্র, দীনদুঃখী, দীপবর্ত্তিকা, দর্শনসাক্ষাৎ, ধীরস্থির, নষ্টভ্রষ্ট, নামযশ, পল্লীগ্রাম, ব্যবসাবাণিজ্য, বিষয়-আশয়, বিষয়সর্ব্বস্ব, বিবেকবুদ্ধি, লম্ফঝম্প, বিহিতবিধান, ভীতসন্ত্রস্ত, ভ্রমপ্রমাদ, মায়াদয়া, মেদমজ্জা, মদভাঙ্গ, রূপলাবণ্য, রক্ষণাবেক্ষণ, রঙ্গকৌতুক, শাখাপল্লব, শক্তসমর্থ, শ্রদ্ধাভক্তি, শান্তশিষ্ট, শুচিশুদ্ধ, শিক্ষাদীক্ষা, স্নেহযত্ন, সর্ব্বসাধারণ, মণিমুক্তা, স্বাগতঅভ্যর্থনা, কলসঘট, নিজস্ব, লজ্জাসঙ্কোচ, অস্থিরচঞ্চল, অধীরউতলা, বেশভূষা, ধনরত্ন, চরিত্রশীল।

(চ) তৎসম+অর্দ্ধতৎসম। যথা :—ছেদ্দাভক্তি, পূজাআচ্ছা, আপ্তবন্ধু, সাধ্যিসাধনা, রণযুদ্ধু, শাপমন্যি, দানউচ্ছুগ্যু।

(ছ) তৎসম+দেশী। যথা :— খাটপালঙ্ক, পাকেপ্রকারে, পাকেচক্রে, চিঠিপত্র, ভুল-ভ্রান্তি, ভারবোঝা, পালপার্ব্বণ, কালাহিম, আসনপিঁড়ি, ফলপাকুড, ফলফুলুরি, ভয়ডর, বাস্তু-ভিটা, কূটকচাল, হিংসাআড়ি, ঝগড়াবিবাদ, খোঁজসন্ধান, খোঁজপত্র, * আড়ালেঅসাক্ষাতে, ইতরছোটলোক, ইতরবাগ্দী, গালমন্দ, ছাইভস্ম, ঝড়ঝঞ্ঝা, তিলকফোঁটা, পাহাড়পর্ব্বত, বাছবিচার, বর্ষাবাদল, মেঘবাদল, বৃষ্টিবাদলা, বিছানাপত্র,* রসকষ, সাড়াশব্দ, হাবভাব, নোংড়াঅপরিষ্কার।

(জ) অর্দ্ধতৎসম+অর্দ্ধতৎসম। যথা :— ঘেন্নাপিত্তি, গুছনথিতন, পাতনথালী, আণ্ডা-বাচ্ছা, কাচ্ছাবাচ্ছা, কেষ্টবিষ্টু, সেয়নাধুর্ত্তু, ছিরিছব্বা।

(ঝ) অর্দ্ধতৎসম+দেশী। যথা :— চিঠিপত্তর, ইত্তিনাড়ি, পোকামাকড, ডাকাবুকো, ছথ্যিধান্দা, আক্রামাঙ্গা, আক্রাগণ্ডা, আন্বাআহিক্কে, ঝগড়াকুলুক্খেত্তর, খোঁজপাতি, চক্করটহল, ছ্যাদাফুটা, ছেঁকপোড়া, দস্যিদামাল, ঘুমনিদ্দে।

(ঞ) দেশী+দেশী। যথা :—হ্যাংলাক্যাংলা, ন্যাকড়াকানি, চিঠিচাপাটি, লুচিপুরি, মোটঘাট, মোটবোঝা, খিস্তিখেউড়, চড়চাপড়, খাঁদাবোঁচা, লুটপাট, লাঠিঠ্যাঙ্গা, নাড়িভুঁড়ি, হাজাপাকুই, বোকাহাবা, হাবাগোবা, পো(য়া)লকুটি, খড়বিচালি, হ্যাংলাপেটুক, ডেয়োডোকলা, ঢিলঢাপরা, খোলাখাপরা, চাঁছিপুঁছি, ছেলেচেঙ্গরা, ডালকড়াই, দালকলাই, ঝাঝরাফুটা, ভুট্টা-জনার, মিঠাইমণ্ডা, ছানাপোনা, ঝগড়াকোঁদল, টুকরাফালি, ঠাটঠমক, কাঠিখোঁচা, খোঁচে-পোঁজে, ভীড়জটলা, খটকিমামড়ী, কোটালজোয়ার, ভুলচুক, ঝুলিঝাকড়া, জোড়াতালি, উলটপালট, ধুতিপাটা, পেতেচুপড়ি, ঝগড়াখুনসুড়ি, কাঁথাকানি, কাঁথাধোকড়া, কাপড়চোপড়, গলিঘুঁজি, গেঁড়িগুগলি, কচিকাঁচা, কুঁচোকাঁচা, কোঠাবাড়ি, ছিটাফোঁটা, কাড়ানাকাড়া, গোদাধুমসো, আড়িআকচ, আঁটসাট, আড়ালেআবডালে, অলিগলি, উড়কুড়, কড়ায়গণ্ডায়, কালিজুলি, ঝুলকালি, খাটাখাটুনি, খালবিল, গালিগালাজ, গুমরগ্যাদা, গোলামরাই, গুণচট, চাটপোঁছ, চাঁছাছোলা, চারাপোনা, চেয়েমেঙ্গে, চব্বচহলট, চিমটাসাঁড়াশি, ছেলেপিলে, ছোটখাট, ছোলাকড়াই, ছাঁপোন, ছোলামটর, ছেলেছোকরা, ঝগড়াঝাঁটি, ঝোপঝাড়, ঝড়-ঝাপ্টা, ঝাঁতলামাদুর, টইটুম্বুর, টকজোঁদা, পাল্লাটক্কর, ঢাকঢোল, তালতোবড়া, তালগোল, তাড়াহুড়া, ঝামেলাঝক্কি, দামালদুরন্ত, দড়িকাছি, ন্যাতাকানি, নেড়াবোঁচা, ফুটিকাঁকুড়, বনবাদাড়, বনঝোড়, বনজঙ্গল, বিছানাচাকড়া, বিছানা-ধোকড়া, মালসাট, মেগেপেতে, মাদুরচাটাই, মাদুরপাটি, রুটিপরোটা, রুটিচাপাটি, লাঠিসোটা, ল্যাঙ্গড়াখোঁড়া, লুকোছাপি, লুটঘাট, শাপলাশালুক, হাঁড়িকুঁড়ি, হাঁকডাক, হাউড়পাগল, হ্যাংলাকুটে, হামাগুড়ি, গুদাম-আড়ৎ, ডামাডোল, প্যাস্তাখেঁচা, ফাঁকতালে।

দেশী+বিদেশী :—দোক্তাতামাক, গুড়ুকতামাক, তোলোহাঁড়ি, ডিজেলহাঁড়ি, কড়িবরগা,

চাবিকাঠি, কামরাকুঠরি, রুটিবিস্কুট, চোঙ্গীকোঁদল, রেস্তকড়ি, ফিতাদড়ি, দুম্বাভেড়া, কাটাবেক, টালিখোলা, তোরঙ্গপ্যাটরা, পাজিনচ্ছার, জরিবুটি, পকেটথলে।

২। যে ক্ষেত্রে অনুবাদাত্মক সমাসের একটি উপাদান বহির্ভারতীয় বিদেশী ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে পড়িতেছে—

(ক) তদ্ভব+বিদেশী: চেরাগবাতি, ময়লাআবর্জ্জনা, খেলতামাসা, গোমস্তাকর্ম্মচারী, চাষআবাদ, কোমরকাঁকাল, জামপেষ, তাসপাশা, ভাগবখরা, ব্যয়বরাদ্দ, ভোগদখল, রাজাবাদশা, দোকানপসার, লজ্জাসরম, স্কুলপাঠশালা, সোনাদানা, মানইজ্জৎ, আতরফুলেল, হাসিখুসি, হাওয়াবাতাস, কাঁটাপেরেক, হাসতামাসা, প্যাকেটমোড়া, আগামবায়না, গরীবভিখারী, হাসিমসকরা, নেশাভাঙ্গ, বাঁধাবন্দোবস্ত, দরজাকপাট, রোঁদপাহারা, কাকুতিমিনতি, তেজারতীমহাজনী, বছরসালিয়ানা, ঠাকুরদেবতা, ধীরেসুস্থে, চাকুছুরি, আস্তেব্যস্তে, ছুতাঅছিলা, ছুতাঅজুহাত, মশলাপাতি, দরদাম, আচারমোরব্বা, কাজঘর, হলঘর, আইলপইল,আস্তিনহাতা, ওজনদাঁড়ি, খোরপোষ, খাদখন্দক, খানাখন্দর, শাস্তিসাজা, ভনবৈঠক, তোয়ালেগামছা, দাঙ্গামারামারি, দিগুণগার, দেনাকর্জ্জ, নেকারবমি, নিক্তিদাঁড়ি, পাকাপোক্ত, বিধর্ম্মীকাফের, ভিতবনিয়াদ, মুচকিহাসি, লাভমুনাফা, হাওলাৎদেনা, কারসুতা, তোলাওজন, খুর্সীপিঁড়ে, ঘোরপ্যাচ, বাজিখেলা, ল্যাঙ্গড়াখোঁড়া।

(খ) তৎসম+বিদেশী: কূলকিনারা, ধনদৌলৎ, শলাপরামর্শ, দুঃখমেহনৎ, সাক্ষীসাবুদ, আসবাবপত্র*, কাগজপত্র*, আক্কেলবুদ্ধি, রাগগোঁসা, দানখয়রাত, দাসীবাঁদি, মনমেজাজ, তত্ত্বতাবাস, তত্ত্বতালাস, মনমর্জ্জি, সাধুপীর, সহ্যসবুর, সখসাধ, আদরআব্দার, ডাক্তারকবিরাজ, হাকিমকবিরাজ, স্বভাবতরিবৎ, স্বভাবসোহবৎ, দেমাকঅহঙ্কার, চিহ্নিনিশানা, ওজরআপত্তি, আসানউপশম, সৈন্যসিপাই, বিচারফয়শালা, ইয়ারবন্ধু, ইসারাইঙ্গিত, কৌশলফিকির, খাতির-যত্ন, খাতাপত্র, চালাকচতুর, জন্তুজানোয়ার, নদীনালা, লোকলস্কর, বিয়েসাদী, দৈত্যদানা, ইস্তকঅবধি, ফলফসল, কলহকাজিয়া, মেওয়াফল, সুবুদ্ধিসুআক্কেল, আনাজপত্র,* সইস্বাক্ষর, শাকসব্জী, খোসামোদ, নির্লজ্জবেহায়া, অসুখব্যায়রাম, অসুখব্যামো, আশ্রয়আস্তানা, অবস্থাগতিক, আক্কেলজ্ঞান, খাজনাপত্র,* গল্পগুজব গহনাপত্র, চেনহার, জিনিসপত্র,* যাত্রাথিয়েটার, দায়বিপদ্, দৃষ্টিনজর, নথিপত্র*, মালপত্র*, ব্যাগকম্বল, তেজঅহঙ্কার, পেশাব্যবসা, সংস্কারমেরামত, রফানিষ্পত্তি, ব্যবস্থাসলিকে, সাঁইকালি, পোষাকপরিচ্ছদ।

(গ) অর্দ্ধতৎসম+বিদেশী: দলিলপত্তর, বেসাদী, দক্যিদানা, দত্যিদানা, অতিথফকির, ডাক্তারবদ্যি, জায়গাআশ্রা, উস্কখুস্ক, আনাজপাতি, খাইখোরাক, খুচরারেজকি, গয়নাপত্তর।

(ঘ) দেশী+বিদেশী: ঘাড়গর্দ্দান, রাঁড়বেওয়া, মুটেমজুর, মাঝিমাল্লা, পরচুল, ঠাট্টাতামাসা, টালবাহানা, ফন্দিফিকির, খোঁজখবর, খোঁজতল্লাস, খানকিছিনাল, ভেল্কিযাদু, নলখাগড়া, খেংরাকোস্তা, সাদামাটা, ক্রুশকাটি, ডালিমবেদানা, বিড়িসিগারেট, টাটকাতাজা, ডিগিতবলা, মালকুস্তি, মাঠময়দান, চশমাঠুলী, আক্রআটক, আড়ালআব্রু, কুস্তিলড়াই, ইয়ার্কিঠাট্টা, কুলিমজুর, ঝাণ্ডানিশান, জামাজোড়া, ঝড়তুফান, ঠারইসারা, হাটবাজার,

সাটেইসারায়, ধাঙ্গড়মুর্দ্দফরাশ, পাউরুটি, গরীবকাঙ্গাল, ফাঁকফুরসৎ, ফাঁকেফিকিরে, হাড়ীমুর্দ্দফরাশ, ঠাট্টাবোটকারা, হুড়কোতশলা, গোনাগাটি, গুণাঘাটি, লেপকাঁথা, আস্তুগোটা, আটাময়দা, ফোক্করফাজিল, আসাসোটা, আপদ্‌ল্যাঠা, আটকালআন্দাজ, কলকাটি, খোসপাঁচড়া, খোসচুলকনা, খানাডোবা, পগারনালা, গয়নাগাঁটি, গচ্চাগুণগার, চিকুটময়লা, চুকাপালং, চাখড়ি, ছুটবাদ, জালজোচ্চুরি, ঝঞ্ঝাটঝামেলা, ডাকাতিরাহাজানি, তক্তাপাটাতন, দায়ঝক্কি, ধারকর্জ্জ, ধাঙ্গড়মেথর, নকলভেজাল, গুণ্ডাবদমাইস, বাক্সপেঁটরা, রসিদড়ি, লুটতরাজ, সিন্দুকপেঁটরা, সেলাইফোঁড়, গজালপেরেক।

৩। যে ক্ষেত্রে অনুবাদাত্মক শব্দটির উভয় উপাদানই অভারতীয় বিদেশী ভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে।

(ক) ফার্সী+ফার্সী :—তরিতরকারি, আনাজতরকারি, মালমশলা, দলিলদস্তাবিদ, পেস্তাবাদাম, ফর্দ্দফিরিস্তি, বাকিবকেয়া, বখেয়াসেলাই, আবদারবায়না, গরীববেচারা, আসরমজলিশ, পীরপয়গম্বর, তরসবুর, নাস্তানাবুদ, বাগবাগিচা, বাগানবাগিচা, দরদস্তর, সাফসুথরা, দাঙ্গাহাঙ্গামা, হাঙ্গামাহুজ্জুত, খতমসুক, জোতজমা, জমিজায়গা, গোলাবারুদ, টোটাবারুদ, বৈঠকখানা, ফরাসজাজিম, ফৌজসিপাই, পাইকবরকন্দাজ, জাপৎখানা, তাকিয়াবালিশ, শালদোশালা, শালআলোয়ান, সইদস্তখত, আরামআয়েস, আদবকায়দা, কায়দাকানুন, আইনকানুন, আইনআদালত, আমীরওমরা, জঞ্জালময়লা, অছিলাঅজুহাত, ওজরঅছিলা, কুচকাওয়াজ, কারকারবার, কলকারখানা, জোরজুলুম, জোরজবরদস্তি, খাতিরনদারৎ, খাতিরতোয়াজ, খুনজখম, গরীবগুরবো, গরীবফকির, নাকচবাতিল, জাঁকজমক, তদ্বিরতদারক, তাকতদ্বির, মেথরমুর্দ্দফরাশ, মুচিমুর্দ্দফরাশ, ধুমধড়াক্কা, নালিশমকর্দ্দমা, পা(ই)কপেয়াদা, মামলামোকর্দ্দমা, নালানর্দ্দমা, খেয়ালখুসি, রুজিরোজগার, তকমাচাপরাস, মক্তবমাদ্রাসা, হিসাবনিকাশ, খেলাতখেতাব, তালুকমুলুক, কালিয়াকোপ্তা, কালিয়াকোর্ম্মা, কলকজা, উকিলমোক্তার, চোগাচাপকান, বাবুর্চ্চিখানসামা, সাহেবসুবো, আবদারআসকারা, আদায়উসুল, আপদ্‌বালাই, ইজেরপাজামা, ওজরঅজুহাত, কুলিকাবারি, কমিকসুর, ঘালজখম, চাকরখানসামা, তসরগরদ, নিরীহবেচারা, নকলমেকি, পীরফকির, ফাইফরমাস, বাগেকায়দায়, বইদপ্তর, বায়নাআবদার, মুচিমেথর, সিপাইসান্ত্রী, সাদাসিধা, সনতারিখ, হাওলাৎকর্জ্জ, হুরীপরী, বিবিবেগম, কাচপরকলা, হরহামেশা, সোরগোল, লেপতোষক, খসড়ামুশাবিদা, রদবাতিল।

(খ) ফার্সী+ইংরাজী :—ছিপিকাক, লটবহর, হোটেলসরাই, আর্দ্দালিচাপরাসী, ফাইন-জরিমানা, হৌজচৌবাচ্ছা, আপিসকাছারি, খেতাবটাইটেল, পিওনহরকরা, ডাকপিওন, ডাকহরকরা, সিন্দুকবাক্স, বেহারাখানসামা, চাপরাসীবেহারা, শীলমোহর, শানপালিস, লাটসাহেব, ইজেরপেনী, কাপপেয়ালা, পেনকলম, পাৎলুনপায়জামা, বেয়ারাচাপরাসী, রেকাবডিস, জেলকয়েদ।

(গ) ফার্সী+পোর্টুগীজ:—শিশিবোতল, ইজেরপ্যাণ্ট, কারিগরমিস্ত্রি, খানাখন্দক, ছাপমার্কা, বদমাসবোম্বেটে, পিস্তলবন্দুক, সাবুদানা, কাজুদানা, রসদরেস্ত, কিরিচবন্দুক।

(ঘ) ইংরাজী+ইংরাজী:—জজম্যাজিষ্ট্রেট, আলপিন, বাক্সতোরঙ্গ, ডিসপ্লেট, বডি-ব্লাউজ, সিনেমাবায়োস্কোপ।

(ঙ) ইংরাজী+পোর্ত্তুগীজ:—জেলগারদ, বালতিটব, টিনক্যানেস্ত্রা, সার্টকামিজ, মেজটেবিল, হুকপ্রেক, স্যাঁকালিপ্যাকেট, সালসাটনিক, প্লেটপিরিচ, ড্রামপিপা, দেরাজ-আলমারি, রেলিংগরাদে, জারবয়েম, ফানেলকোঁদল, টেপফিতা।

(চ) পোর্ত্তুগীজ+পোর্ত্তুগীজ:—কোচকেদারা, নোনাআতা, চাবিচাবলা।

(ছ) পোর্ত্তুগীজ+ফরাসী—সায়াসেমিজ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বস্তুজগতে যেরূপ কোন পদার্থ একক অবস্থা হইতে যুগ্ম অবস্থায় দৃঢ়তর হয়, খুব মনে হয়, ভাষার ক্ষেত্রেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। কোন ভাব প্রকাশে যখন আমরা শব্দবিশেষের সহায়তা গ্রহণ করি, তখন কখনও কখনও আমাদের সঙ্কল্প সাধনের পথে যেন অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ যখন কোন ধারণা কাহারও মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতে চাই। আমরা ভাবি, বোধ হয় বলাটা বেশ জোরাল বা যুৎসই হইল না। তখন হয় আমরা একই কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার বলি, স্বরাঘাতের আশ্রয় গ্রহণ করি, নয় যে শব্দটির উপর আমাদের লক্ষ্য, সেটি পুনরুল্লেখ করি—বাহুল্যভয়ে বিরত থাকি না। ভারতবর্ষের দেশী ভাষাগুলির ইহার প্রায় সমধর্ম্মী একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহাকে আমরা ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দ নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে মূল ও সংশ্লিষ্ট শব্দ দুইই অবিকৃত ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুকার শব্দটির আদিধ্বনি মূল শব্দের আদিধ্বনি হইতে পৃথক্ থাকিত, তাহাও আবার নির্দ্দিষ্ট কতিপয় ধ্বনির গণ্ডীর মধ্যে। শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় গঠিত অনুকার শব্দকে 'লেজুড়'শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা অসমীচীন হইবে না। যাহাই হউক, ভাবের আতিশয্য ও ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশের বাসনা হইতে উদ্ভূত এই পন্থা অবলম্বন করিয়া আসা হইতেছে এবং দেশী ভাষাগোষ্ঠীর নিকট আমাদের ভারতীয় ভাষাসমূহ এ বিষয়ে ঋণী। অনুবাদাত্মক সমাসের বিকাশে উপর্য্যুক্ত মনোবৃত্তি পরোক্ষভাবে কাজ করিয়াছিল বলিয়া আমার ধারণা।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'মদিরা-গৃহ'

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

কৌটিল্যের নামে প্রচলিত 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থখানি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থের সুদীর্ঘ বিবরণী পণ্ডিত-সমাজে প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কৌটিল্য নামধারী কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি সত্যই এই গ্রন্থের রচয়িতা কি না বা সত্যই এ পুস্তকের রচনাকাল কি, ইত্যাদি নানা জটিল প্রশ্ন লইয়া বিস্তর মতবিরোধ থাকিলেও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্ব্বস্বীকৃত। এবং এই কারণেই ইহাকে কেন্দ্র করিয়া টীকা, ভাষ্য, আলোচনা, অনুবাদ প্রভৃতিও রচিত হইয়াছে প্রচুর। অর্থশাস্ত্র অত্যন্ত দুরূহ পুস্তক—তাই পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইহার কোনও কোনও অংশের সম্পূর্ণ অর্থ এখনও পরিষ্কার বুঝা যায় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে উক্তপ্রকারের একটি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই সামান্য আলোচনা করিব।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধিকরণের "দুর্গনিবেশ" নামক প্রকরণে দুর্গনির্মাণ ও বিশেষভাবে দুর্গের আভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এক স্থানে বলা হইয়াছে—

"অপরাজিতাপ্রতিহতজয়ন্তবৈজয়ন্তকোষ্ঠকান্ শিববৈশ্রবণাশ্বিশ্রীমদিরাগৃহং চ পুরমধ্যে কারয়েত।"[১]

সামশাস্ত্রিকৃত উপরিউক্ত অংশের ইংরেজী অনুবাদ এই রকম,—In the centre of the city, the apartments of gods such as aparajita, apratihata, jayanta, vaijayanta, siva,vaisravana, Asvina (divine physicians) and the abode of Goddess Madira (Sri-Madira Griham) shall be situated।" দেখা যাইতেছে, সাম শাস্ত্রী মহাশয় 'শ্রীমদিরা-গৃহ' কথাটিকে স্বতন্ত্র ধরিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন—"মদিরা দেবীর গৃহ" বা মদিরা দেবীর পূজা-মন্দির। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর কৃত অর্থ-শাস্ত্রের যে নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতেও "মদিরা-গৃহ" শব্দটিকে স্বতন্ত্র শব্দ হিসাবেই স্থান দিয়াছেন।[২] এই অনুবাদ স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত। কেন না, "শ্রীমদিরা-গৃহ" কথাটিকে পৃথক্ করিয়া Abode of Goddess Madira অনুবাদ করা যে চলে না,—সংস্কৃত অংশটির বিশ্লেষণ করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। "গৃহ" শব্দটি ওখানে কেবলমাত্র 'শ্রীমদিরা'র সঙ্গে নয়, তার পূর্বের "শিববৈশ্রবণাশ্বি—"র সঙ্গেও যুক্ত। আর, এতগুলি প্রসিদ্ধ দেবতাকে বাদ দিয়া "শ্রী" শব্দটি মদিরা দেবীর সম্মানার্থে বসানো হইয়াছে—Goddess বা দেবী অর্থে,

১। Arthasastra Text (edited by R. Samasastri), pp. 55-56।

২। সামশাস্ত্রী, অর্থশাস্ত্রসূচী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৩১৪।

এ কথা মানিয়া লওয়াও কঠিন। উহাকেও আলাদা শব্দ হিসাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। জার্মাণ পণ্ডিত মাইয়ার উক্ত অংশটিকে এই ভাবেই দেখিয়াছেন।

এখানে মাইয়ার সাহেব 'শ্রী'কেও একটি স্বতন্ত্র দেবতা বা দেবী হিসাবেই দেখিয়াছেন। সুতরাং তাঁর অনুবাদ অনুযায়ী দেবতার সংখ্যা বাড়িয়া নয় হইতে দশ হইয়াছে; যথা— অপরাজিত, অপ্রতিহত, জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, শ্রী এবং মদিরা।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সর্বপ্রথম আবিষ্কার, সম্পাদন এবং অনুবাদ করেন পণ্ডিত সামশাস্ত্রী। তাঁহার সম্পাদিত সংস্করণ বাহির হওয়ার পরে অর্থশাস্ত্রের আরও দুএকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সবগুলিতেই এই অংশের পাঠে শেষ ভাগে "মদিরা-গৃহ" শব্দটিকে অক্ষুন্ন রাখা হইয়াছে। সাধারণতঃ এ যাবৎ কাল পণ্ডিতমণ্ডলী এই পাঠ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়াছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া "On the Antiquity of Image Worship in Ancient India" নামে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে অর্থশাস্ত্রের এই উক্তিটির উপর নির্ভর করিয়া তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, অর্থশাস্ত্রের যুগে অপ্রতিহত, অপরাজিত ইত্যাদি হইতে মদিরা পর্য্যন্ত দেবদেবীর মন্দির ও মূর্তি নির্মাণের বিধি সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল।[৪] ডাঃ বড়ুয়া এখানে শ্রী এবং মদিরা, এই দুইটিকে পৃথক্ করিয়াছেন, অথচ সাম শাস্ত্রীর অনুকরণে "মদিরা" শব্দটিকে ঐ নামধেয়া দেবী অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে "মদিরা"নাম্নী কোনও দেবীর উল্লেখ আমরা পাই না। অর্থশাস্ত্রের উপরিউক্ত অংশবিশেষে অন্যান্য যে সকল দেবদেবীর নাম করা হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই অন্য সূত্রে আমাদের পরিচিত। জৈন উত্তরাধ্যয়নসূত্রে "অনুত্তরা সুরা" বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে "বিজয়", "বৈজয়ন্ত", "অপরাজিত", "জয়ন্ত" এবং "সর্ব্বার্থসিদ্ধ"-গণের নাম পাওয়া যায়।[৫] শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং শ্রী বা লক্ষ্মী এতই সুপরিচিত যে, ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিবার কিছু নাই। আর একটি বিশেষ কথা এই যে, উল্লিখিত প্রত্যেকটি দেবদেবীই অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং তৎকালীন সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধেয়। ইহাদের সঙ্গে "মদিরা"র মত অজ্ঞাত-নাম্নী কোনও দেবীকে যুক্ত করা এবং মঙ্গলকামনায় ইহাদের সকলের সঙ্গে "মদিরা" দেবীর জন্যও দুর্গমধ্যে প্রকোষ্ঠ স্থাপন করা অস্বাভাবিক ও প্রায় অবিশ্বাস্য। জৈন উত্তরাধ্যয়নসূত্রের উল্লিখিত তালিকায় বা বাদবাকী অন্যান্য দেবদেবীর নামের সঙ্গে সাহিত্যে বা প্রাচীন লিপিতে কুত্রাপি "মদিরা"র নাম যুক্ত পাওয়া যায় নাই।

অধ্যাপক বড়ুয়া তাঁহার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, মদিরা দেবী আপস্তম্ব-কথিত মিঢুষীর সঙ্গে অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এই "মিঢুষী"র পূজা যে অত্যন্ত সমারোহ সংকারে কোন দিন প্রচলিত ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই, অন্যত্র কোথাও ঐ দেবীর

৪। Journal of the Indian Society of Oriental Art, vol xi (1943), p. 66

৫। H. Jacobi, Jaina Sutras, Part II (Saered Books of the East, vol. XLV) p. 227

উল্লেখও নাই। এ ধরণের একটি অখ্যাত-নাম্নীর সঙ্গে "মদিরা" দেবীকে অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিলেও (ইহা শুধু অনুমানই মাত্র) শেষোক্তার গোষ্ঠী এবং পরিচয় নির্ধারণে কোনও সাহায্য হয় না। জার্মাণ পণ্ডিত মাইয়ার অনুমান করিয়াছেন, "মদিরা" কোনও তান্ত্রিক দেবীর নাম হইবেও বা। এ প্রসঙ্গে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীনতম তন্ত্রসাহিত্যে "মদিরা"নাম্নী কোনও পূজনীয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

সমস্ত দিক্ বিচার করিয়া দেখিলে এ কথা বিশেষভাবে মনে হয় যে, অর্থশাস্ত্রের উল্লিখিত অংশটিতে "মদিরা" শব্দটি একেবারেই অর্থসঙ্গতিহীন। যদি সংশোধন করিয়া "মন্দির" কথাটি বসান যায়, তাহা হইলে একটি সুসঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ "শিব-বৈশ্রবণাশ্বি-শ্রীমন্দিরগৃহং" এই পদটিকে শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং শ্রীদেবীর মন্দির-গৃহ বলিয়া অনুবাদ করিলে অর্থটি স্পষ্ট ও শোভন হয়। দ্বিতীয়তঃ "কোষ্ঠকান্" এবং "মন্দিরগৃহং" এই দুইটি শব্দ থাকাতে পরবর্তী "চ"এর প্রয়োগও অর্থহীন হইয়া পড়ে না। "মন্দিরগৃহ" কথাটি অবশ্য রচনাভঙ্গীর দিক্ হইতে সুষ্ঠু নয়। কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, রচনাসৌষ্ঠবের জন্য কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রসিদ্ধ নয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষভাবে পুথি-সাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই সব পুথির লিপিকারেরা কিরূপ অবিশ্বাস্য রকমের ভুল করিতেন। এক লিপিচাতুর্য্য ছাড়া বিদ্যা বা অন্তর্দ্দৃষ্টির বালাই ইহাদের বিশেষ ছিল না। সুতরাং ইহাদের অজ্ঞতা বা অযত্ন-প্রসূত ভুলের বোঝা পরবর্তী যুগের পাঠক ও গবেষককে বহিতে হয়। খুব সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রেও হইয়াছে ঠিক তাহাই। অশিক্ষিত লিপিকারের লেখার ভুলে "মন্দির" শব্দ বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে "মদিরা"।

ত্রিনাথ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম্ এ

পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যার নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত এক লৌকিক দেবতার নাম ত্রিনাথ। ইঁহার কোনও মূর্তি, মন্দির বা উপাসনার নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। সাধারণ দেবতার পূজার মত ইঁহার পূজায় পুষ্প বিল্বপত্র বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। যে কোন দিন সন্ধ্যার সময় উঠানে বা বারান্দায় কয়েক জনে মিলিত হইয়া ইঁহার আরাধনা করা হয়। এজন্য দরকার মাত্র তিনটা পয়সার—এক পয়সার সরিষার তেল, এক পয়সার পান-সুপারি এবং এক পয়সার গাঁজা। জিনিষগুলি তিন ভাগে সাজাইতে হয়। সরিষার তেলে তিনটী প্রদীপ জ্বালাইতে হয়। পান-সুপারি তিন ভাগে রাখিতে হয় এবং তিন কলিকা গাঁজা তৈয়ার করিতে হয়। এইগুলিই পূজার অপরিহার্য উপকরণ। তবে সমাগত লোকদের জন্য কিছু বাতাসারও ব্যবস্থা সাধারণতঃ করা হয়। উপকরণগুলি সামনে সাজাইয়া দেবতার উপাখ্যান বা কথা বলা হয়। তার পর দেবতার মাহাত্ম্যসূচক গান ও ছড়া[১] আবৃত্তি, প্রসাদগ্রহণ ও গঞ্জিকাসেবন।' কয়েক জনে মিলিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয় বলিয়া ইঁহার নাম ত্রিনাথের মেলা। সংসারের নানাবিধ বিপদ্-আপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ত্রিনাথের মেলা মানত করা হয়।

১। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়া অঞ্চলে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি সুর করিয়া আবৃত্তি করা হয়:—

আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ কিছু নয় রে খায়।
এক পয়সার ত্যাল দিয়া তিন বাতি জ্বালায়।
আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ কিছু নয় রে খায়।
এক পয়সার পানগুয়া তিন ভাগে সাজায়।
আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ কিছু নয় রে খায়।
এক পয়সার গাজা দিয়া তিন কল্‌কি সাজায়।
আমার ঠাকুর তেননাথ যে করিবে হেলা।
হাত পাও শুকাইয়া যাবে বন্ন হইবে কালা।
আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ যে করিবে হেলা।
হাত পাও শুকাইয়া যাবে চউখ দিয়া বাইর হবে ড্যালা।
কলিতে তেন্‌নাথের মেলা।
খোড়ায় নাচে কাণায় দেখে বোবায় বোলে বোমভোলা।
সাধু রে ভাই দিন গেলে তেন্‌নাথের নাম লইও।
তেল খায় ব্রহ্মা[র]রে ভাই বিষ্ণু[র] খায় রে পান।
মহাদেবের সিদ্ধি খাইলে শীতল হয় রে প্রাণ।

বিক্রমপুরে প্রচলিত রমাই ফকিরের রচিত কয়েকটা ছড়া শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিক্রমপুরের ইতিহাসে (প্রথম সংস্করণ—পৃ. ৩৭২) প্রদত্ত হইয়াছে।

চৌধুরী বিশ্বনাথ ধন্বন্তরি মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টাদশ খণ্ডে (পৃ. ২৫-৭) ত্রিনাথের মাহাত্ম্যসূচক এক উপাখ্যানের বিবরণ দিয়াছিলেন।[২] তাঁহার এই উপাখ্যান কোন্ স্থান হইতে সংগৃহীত, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এই দেবতার কোনও পাঁচালি তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধের পাদটীকায় পত্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছিলেন—'আমরা উহা সংগ্রহ করিয়াছি। আগামী সংখ্যায় উক্ত পাঁচালীর বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।' দুঃখের বিষয়, পরিষৎ-পত্রিকায় পাঁচালি লইয়া এ পর্যন্ত আর কোনও আলোচনা হয় নাই। ত্রিনাথের পাঁচালির কোনও পুথি সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় নাই। কিন্তু ত্রিনাথের পাঁচালি নামে একাধিক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, এইগুলির মধ্যে কোন কোনখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন—অধিকাংশই আধুনিক। ইহাদের মধ্যে মহেশচন্দ্র দাস-রচিত পাঁচালি ১০৫নং অপার চিৎপুর রোড হইতে কানাইলাল শীল কর্তৃক (কলিকাতা, ১৩৩৬) ও ৮২নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে তারাচাঁদ দাস কর্তৃক (কলিকাতা, ১৩৪১) প্রকাশিত। তারাচাঁদের প্রকাশিত পুস্তিকা নবম সংস্করণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পাঁচালি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হওয়া সম্ভব। প্রধানতঃ ইহাতে বর্ণিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন (১৬২নং নিমু গোস্বামীর লেন হইতে শ্রীজগন্নাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত—সন ১৩৩৫ সাল) ও অশ্বিনীকুমার সোম তত্ত্বনিধি (১৩৩৮—এ. কে. সোম এণ্ড সন্স, সোমলাইব্রেরী, ফেনী, নোয়াখালী) দুইখানি পাঁচালি রচনা করেন। খুলনার ডাক্তার অম্বিকাচরণ বিশ্বাস (বাইসাস্তা, পোঃ—চালনা) ১৩২৫ সালে উড়িয়া ভাষা হইতে অনূদিত একখানি পাঁচালি প্রকাশ করেন। তাঁহার অবলম্বিত মূল উড়িয়া পুথি ত্রিনাথমেলা নামে কাঁথির নীহার প্রেস হইতে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে (সপ্তবিংশ সংস্করণ—সন ১৩৪০ সাল)।

বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকাশিত এই সমস্ত পুস্তিকা ত্রিনাথের জনপ্রিয়তার নিদর্শন সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে বর্ণিত মূল কাহিনীর ঐক্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়[৩]। এই কাহিনীতে দেবতার স্বরূপের যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক।

ওহে হরি দীনবন্ধু অনাথ জনার বন্ধু
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি মহেশ্বর।
তিন দেব একত্তরে পূজা প্রকাশের তরে
ত্রিনাথ হইল অবতর।—মহেশচন্দ্রের পাঁচালি।

বাংলা কাহিনী হইতে উড়িয়া কাহিনীটী বিস্তৃততর। মূল কাহিনীটী এইরূপ—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্বস্ব একটী গরু হারাইয়া যায়। আত্মহত্যা করিতে উদ্যত নিরুপায় ব্রাহ্মণ

২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বিক্রমপুরের ইতিহাসে (প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৩৭২) ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে (১।৮৮) বিক্রমপুর ও ত্রিপুরায় এই দেবতার পূজার উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। আশ্চর্যের বিষয়, ধন্বন্তরি মহাশয় বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত এই কাহিনীর কোনও মিল নাই।

দৈববাণীদ্বারা ত্রিনাথের পূজা করিতে আদিষ্ট হন। দেবতার নির্দেশে তিনি নদীতীরে তিনটী পয়সা পাইয়া উহা দিয়া তেল, গাঁজা ও পান কেনেন। তিনি কোঁচার কাপড়ে তেল লইতে চাহিলে মুদি তাঁহাকে ঠকাইবার চেষ্টা করে ও নিজে অপদস্থ হয়। ব্রাহ্মণ ত্রিনাথের ধ্যানে মগ্ন হইলে তাঁহার গুরু আসিয়া উপস্থিত হন এবং লাথি মারিয়া সমস্ত পূজোপকরণ নষ্ট করিয়া দেন এবং সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এদিকে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে শিষ্যের অনুগ্রহে ত্রিনাথের কল্কেপোড়া ভস্ম গায়ে মাখাইয়া তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিতে সমর্থ হন। তিনি নিজেও ত্রিনাথের মেলার আয়োজন করেন। অনেক লোক সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার বাড়ী আসিতে থাকে। পথে এক বোবা ও এক খঞ্জ যাত্রীদের নিকট ত্রিনাথের বৃত্তান্ত শুনিয়া পূজা মানত করিল এবং তাহাদের অন্ধত্ব ও খঞ্জত্ব দূর হইল।

উড়িয়া কাহিনীর মতে ব্রাহ্মণের এই নবীন দেবতার পূজায় রাজা অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পূজায় বাধা দেন এবং নানারূপে বিপন্ন হন। পরে ত্রিনাথের পূজা করিয়া বিপন্মুক্ত হন। এক সদাগর ত্রিনাথের পূজা বিস্মৃত হইয়া কিরূপে বিপন্ন হন ও ত্রিনাথের কৃপায় উদ্ধার পান, তাহার কাহিনীও উড়িয়া পাঁচালিতে দেওয়া হইয়াছে। গুরুর কাহিনী উড়িয়া পাঁচালিতে একটু পৃথক্। এক বৈষ্ণব ত্রিনাথের মেলায় আসিতেন, তাঁহার গুরু একদিন তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে মেলায় আসিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন এবং মেলার জিনিষপত্র লাথি দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ফলে তিনি নানা বিপদে পড়েন ও পরে ত্রিনাথের কৃপায় উদ্ধারলাভ করেন।

সভাপতির অভিভাষণ

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত]

স্যর্ শ্রীযদুনাথ সরকার

আমার জীবনকাল এখন এক শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ অতিক্রম করিতে চলিল। তাহার উপর আমার কতকগুলি আরব্ধ গবেষণা-কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং আজ আমি পরিষদের সেবা হইতে বিদায় লইবার ন্যায্য দাবী করিতে পারি।

যদিও আমি এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতি প্রথম বার নির্ব্বাচিত হই ২৭ বৎসর পূর্ব্বে, সেটা নামমাত্র ছিল, মফস্বলবাসিরূপে। কিন্তু কলিকাতায় বাস আরম্ভ করিয়া গত এগার বৎসর ধরিয়া সভাপতি ও সহকারী সভাপতিরূপে আমি ইহার পরিচালনার কাজ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে করিতে পারিয়াছি। স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমার সঙ্গে পালাক্রমে সভাপতি ও সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করায়, তাঁহার শেষ জীবনে সাহিত্য-পরিষদের যে আশ্চর্য্য উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহার সব প্রচেষ্টায় তাঁহার সহযোগ লাভ করিয়া, তাঁহার কার্য্য সফল করিতে সাহায্য করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। কর্ম্ম-জীবনের অন্তে আজ আমি এখানকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ ভুলিয়া যাইতেছি; কিশোর বয়সে আমরা দুজন প্রেসিডেন্সি কলেজে আগপাছ সহপাঠী ছিলাম; জীবন-সন্ধ্যায় আমাদের দুজনের এই যুক্ত চেষ্টার সফলতার আনন্দই আজ আমার মনে আর সব স্মৃতিকে মুছিয়া ফেলিতেছে।

এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণের সম্পত্তি। এরূপ প্রতিষ্ঠানের গৌরব—গৌরব কেন, সুস্থ জীবন পর্য্যন্ত—নির্ভর করে কর্মীদলের সমবেত চেষ্টা ও উচ্চ চরিত্রের উপর। যখন এক দল লোক একই মহান্ উদ্দেশ্য সম্মুখে ধরিয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং স্বার্থহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ সম্পূর্ণ দমন করিয়া, কোন ক্ষেত্রে জনহিতকর কাজ করেন, এবং ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ঐ কাজটি অবিচ্ছিন্নভাবে চালাইতে সক্ষম হন, তখনই তাঁহারা নিজেদের পরিকল্পিত কার্য্যটিকে সফলতায় পৌঁছাইতে পারেন। নহিলে তাঁহাদের সাধনার সিদ্ধি সম্ভব নহে। এইরূপ ক্রমাগত সুব্যবস্থা না থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠানটি বৎসর বৎসর এক এক নূতন ওলটপালটের ফলে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া চলিতে থাকে। ফ্রান্সদেশের গণতন্ত্রে গত ২১ বৎসরে ৪২ বার ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিমণ্ডলের ভাঙ্গন-গড়ন হয়; এবং তাহার ফল ফ্রান্সের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা।

এইরূপ এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ জনসেবার প্রাণালীকে দল পাকান বলিয়া নিন্দা করিবার পূর্ব্বে ইহার কৃত কার্য্যগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ক্ষমতার যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা দিয়াই সেই ক্ষমতার নৈতিক মূল্য বুঝা যায়। বাহিরের জগতে যে সব প্রলয়ঝঞ্ঝা গত সাত বৎসর বাঙ্গলার উপর দিয়া গিয়াছে, তাহা আপনারা জানেন,—অর্থহ্রাস, লোকনাশ, বাড়ীঘর হইতে উচ্ছেদ, সংস্কৃতির কাজে বিপত্তি, এ সব আপনারা সকলেই ঘরের

সব ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ও ইহার কোনটি হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তাহার উপর কতকগুলি আভ্যন্তরিক কারণে পরিষদের কার্য্যপরিচালনা সব সময় সহজ বা সুখপ্রদ হয় নাই।

কিন্তু হীরেনবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বনিম্ন কার্য্যনির্ব্বাহক এবং বেতনভোগী কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত যাঁহারা সকলে অক্লান্ত চেষ্টায় পরিষদ্‌কে সফলতার এই উচ্চ চূড়ায় তুলিয়াছেন, আমার কর্ম্মজীবনের সন্ধ্যাকালে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। একজন জগৎ-বিখ্যাত ইংরাজ স্থপতির সমাধিফলকে লেখা আছে, "ইহাঁর স্মৃতিচিহ্ন যদি চাও, তবে এই মন্দিরের চারি দিকে তাকাও।" সেই মত যদি কেহ আমাকে বলেন, "তুমি যে কর্ম্মীদের এত প্রশংসা করিলে, তাঁহারা এমন কি করিয়াছেন?" তবে তাহার উত্তরে আমি বলিব, "তাঁহাদের কীর্ত্তির জন্য দেখুন, এই পরিষদ্‌হলের বর্ত্তমান রূপ, এই রমেশ-ভবনের দ্বিতল গৃহ, এই সব সুষ্ঠু সংস্করণ বঙ্গ-সাহিত্য-রত্ন-গ্রন্থমালা ও সাহিত্যিক-জীবনী ও প্রমাণপঞ্জী,—আর আজকার উদ্বৃত্তপত্রে প্রকাশিত আমাদের পুঁজির অঙ্ক এবং বারো বৎসর আগে ঐ ঐ ফণ্ডের কি দশা ছিল।"

আমাদের বয়স্থ সদস্যদের স্মরণ থাকিবে, বারো বৎসর আগে পরিষদের আর্থিক অবস্থা কি ভীষণ শঙ্কাজনক ছিল; তখন কর্ম্মচারীদের বেতন দু মাস করিয়া বাকী থাকিত, কাগজের দাম, দৈনিক খরচ ও প্রেসের দেনার জের চলিত; এর উপর স্থায়ী তহবিল হইতে সাময়িক-ভাবে ধার লইয়া তাহাতে ও বাজার-দেনায় আট হাজার টাকা ঘাটতি পড়িয়াছিল। দেনা শোধের পথ দেখা যাইত না, আট নয় হাজার টাকার উপর অনাদায়ী মাসিক চাঁদা খাতায় লেখামাত্র ছিল। আর, আজ ক'বৎসর ধরিয়া সব কর্ম্মচারীই ঠিক সময়ে বেতন পাইতেছেন, দুঃসময় দেখিয়া সকলকেই বেতন বৃদ্ধি, ভাতা এবং বোনাস দিয়া রক্ষা করিয়া হৃষ্টচিত্তের কাজ পাওয়া যাইতেছে। স্থায়ী তহবিলের সব পূর্ব্বঋণ শোধ করিয়া, ঐ তহবিল বাড়াইয়া ষোল হাজার করা হইয়াছে।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে ঝাড়গ্রামের বদান্য রাজা নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর দশ হাজার টাকা দান করিয়া সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশের এক ফণ্ড স্থাপিত করেন। এই সাত বৎসরে পরিষদের কর্ম্মীদের পরিচালনায় ফণ্ডের মূলধন বাড়িয়া ১৩৮০০৲ হইয়াছে, এবং ফণ্ডের প্রকাশিত ২৬,০০০৲ দামের পুস্তক বিক্রয়ের জন্য মজুদ আছে—অর্থাৎ সমস্ত খরচ বাদে ফণ্ডের মূলধন প্রায় চারি গুণ হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে লালগোলার বদান্য মহারাজ স্যর যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর একটি প্রকাশন-ফণ্ড স্থাপন করিয়াছিলেন। পরিষদের এই আজন্ম-সুহৃদ্ শতায়ু হইয়াও আমাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন; তাঁহাকে এবং স্বর্গীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্রকে আজ আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্মরণ করি।

কিন্তু উচ্চ অট্টালিকা বা স্ফীত কোষাগার দিয়া সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানকে বিচার করা হয় না। আমার গত এগার বৎসরে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় কি কাজ করিয়াছি, তাহাই দেখি। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ সেবকদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রথমে সুন্দর সংস্করণে ছাপা

হয়, আমাদের অর্থে নহে, কিন্তু আমাদের কর্ম্মীদের যত্নে। তার পর আমাদের নিজস্ব মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, ভারতচন্দ্র, এ সকলের গ্রন্থাবলীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ শেষ করিয়া রামমোহনের বাঙ্গলা গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছি, একখানি মুদ্রিত হইয়াছে। এর পর রামমোহন শেষ এবং হেমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আরম্ভ করা যাইবে স্থির হইয়াছে। আলালের ঘরের দুলালের পরিষৎসংস্করণ দুই বার ছাপিতে হইতেছে, বঙ্কিম ও মাইকেলের কতকগুলি গ্রন্থ দ্বিতীয়, এমন কি, তৃতীয় বার প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইয়াছি; কারণ, পণ্ডিতসমাজে ও শিক্ষাজগতে সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণই প্রামাণিক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্রের "পালামৌ" শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ আকারে আমরা ছাপিয়াছি। সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালার পঞ্চাশ সংখ্যা বাহির হইয়াছে এবং কোন কোন খণ্ড দুই তিন বার ছাপিতে হইয়াছে।

ইংরাজী ১৮৬৭ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য বাঙ্গলা বই প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বিশুদ্ধ তালিকা বহু পরিশ্রমে সংকলন করা হইতেছে। ইহা ছাপিলে আমাদের সাহিত্য-গবেষণাকারীদের বিশেষ সুবিধা হইবে। পরিষদ্ এই সব কাজ কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না লইয়া সম্পন্ন করিয়াছে, যাহার দৃষ্টান্ত অন্য দেশে দুর্লভ।

সম্পত্তি রক্ষার দিক্ হইতে গত কয়েক বৎসরে নিয়মাবলী ও ট্রষ্টডীড্ (ন্যাসপত্র) সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে সংশোধিত করা হইয়াছে, নূতন নিয়মের দ্বারা কাজের সুব্যবস্থা ও পরিষদের স্বার্থরক্ষা করার পথ সুগম করা হইয়াছে। আইনের কাজে স্বর্গীয় হীরেন্দ্রবাবুর মত সুহৃদ্-সহায়কের পদ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সুচারুরূপে পূরণ করিয়াছেন।

এই সুদীর্ঘ কাল অতি ঘনিষ্ঠভাবে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য দেখিয়া, ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে কটি কথা আমার মনে স্থান পাইয়াছে, তাহাই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

প্রথমতঃ, আমাদের তরুণ আগ্রহশীল কর্ম্মী চাই। আপনাদের সভাপতিগণ অনেক বর্ষ ধরিয়া বাহাত্তরের নিকটে বা তদূর্দ্ধে পৌঁছিয়াছেন, সহকারী সভাপতিগণও প্রায়শই তদ্রূপ। এগুলি যেন ভব্যতার খাতিরে করা হয় ধরিলাম। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মিগণ তরুণ না হইলে প্রতিষ্ঠান পঙ্গু হইয়া ক্রমে মারা যায়। আমরা নানা বিভাগে শ্রমী, সজাগ, স্বার্থত্যাগী, যুবক সাহিত্য-সেবক চাই। আমাদের ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, দীনেশচন্দ্র ও চিন্তাহরণ, সকলেই পরিণতবয়স্ক, বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছেন। ইঁহাদের স্থান লইবার মত লোক কোথায় তৈয়ারী হইতেছে, আমি ত দেখিলাম না। দ্বিতীয়, একজন শিক্ষিত সাহিত্যিক অথচ কর্ম্মকুশল বেতনভোগী সেক্রেটারি আবশ্যক, যিনি প্রত্যহ তিন চারি ঘণ্টা করিয়া পরিষদে আসিয়া কার্য্যচালনা করিবেন। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল এ জন্য একজন পণ্ডিত প্রফেসরকে মাসিক দেড় শত টাকা পাথেয় দিয়া নিযুক্ত করিয়া এই দু'তিন বৎসরে আরও কার্য্যে বেশ উন্নতি করিয়াছে। তৃতীয়, আমাদের স্থায়ী তহবিলে যদি আরও দশ বারো হাজার টাকা বাড়ান যায়, তবে উহার সুদ হইতে অন্ততঃ অর্দ্ধেক মাসিক বেতন পূরণ হইবে; কর্ম্মচারীরা নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিবে। চতুর্থ, আরও একজন লাইব্রেরিয়ান আবশ্যক, কারণ, গ্রন্থসংখ্যা বাড়িয়াছে এবং দ্রুতবেগে অসম্ভব বাড়িতেছে। এগুলির যত্ন

ও রক্ষা করার জন্য বেহারারা যথেষ্ট নহে। পঞ্চম, আমেরিকার বিখ্যাত পুস্তকাগারে যেমন মহাপণ্ডিত উপদেষ্টা বসিয়া থাকেন, সেইরূপ পাঠে সাহায্যকারী অধ্যাপকদের কিছুক্ষণ করিয়া যদি পরিষদে আনিয়া বসান যায়, তবেই আমাদের এই বিশাল গ্রন্থাগার সার্থকজীবন এবং ফলপ্রসূ হইবে। এজন্য তাঁহাদের কিছু দক্ষিণা দিতে হইবে। ষষ্ঠ, কলাগৃহের দ্রব্য ও মুদ্রাগুলির বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত ও মুদ্রণ করা অত্যাবশ্যক। ইহাতে বিলম্ব করিলে আমাদের দুর্নাম ও পার্থিব ক্ষতি হইবে। আমাদের ইংরাজী পুস্তক-সংগ্রহও অমূল্য, তাহার ক্যাটালগ ছাপিতে হইবে। সপ্তম, সকলের উপর চাই সদস্যগণের মধ্যে সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের স্পৃহা, সমবেত চেষ্টা করিবার আগ্রহ, প্রকৃত সাহিত্যসেবীর মনোবৃত্তি। ইহার অভাবে কোটি টাকার প্রতিষ্ঠানও বন্ধ্য হইয়া যায়, কালের কঠোর শাসনে প্রাণ হারায়। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ স্থিরবুদ্ধি কর্ম্মঠ সেবকগণ পাইব, এই আশায় বুক বাঁধিয়া আছি। ইহাই আমার বিদায়-প্রার্থনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের এই দুই জন বান্ধব আছেন—১। মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—১৩৫১ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা—

বিশিষ্ট-সদস্য—১। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, ২। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং ৩। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজীবন-সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৪। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৫। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায় এবং ১৬। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১২ হইয়াছে।

মৌলভী-সদস্য—কেহই এই শ্রেণীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের শেষে ১১৫৯ ছিল।

সহায়ক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ১৫ ছিল।

পরলোকগত সদস্যগণ—(ক) আজীবন-সদস্য—১। প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ২। লালবিহারী দত্ত।

(খ) সাধারণ-সদস্য—১। অমৃতনারায়ণ গুপ্ত, ২। কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, ৩। কেশবচন্দ্র রায়, ৪। গঙ্গাধর ঘোষ, ৫। নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যো-পাধ্যায়, ৭। পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য, ৮। বাহাদুর সিংহ সিংহী, ৯। যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, ১০। রামশশী মিত্র, ১১। সতীশচন্দ্র আঢ্য, ১২। সন্তোষকুমার দত্ত, ১৩। ডাক্তার সরসীলাল সরকার।

ইঁহাদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক, গ্রন্থাধ্যক্ষ, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য এবং বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারিরূপে বহু দিন পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী—১। গিরিজাকুমার বসু, সহকারী সম্পাদক ও আয়-ব্যয়পরীক্ষকরূপে পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন। ২। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩। মহা-মহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন, ৪। চারুচন্দ্র রায়, ৫। হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ইঁহারা সকলেই এককালে পরিষদের সদস্য ছিলেন, এবং ৭। সরোজনাথ ঘোষ।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক)

পঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন—৩১এ ভাদ্র, (খ) মাসিক অধিবেশন—২৯এ পৌষ প্রথম, এবং ২৬এ চৈত্র দ্বিতীয়। এই সকল অধিবেশনে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য—সাধারণ ও অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচন, ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচন, প্রবন্ধাদি পাঠ ও সদস্যগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ হয়।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—আলোচ্য বর্ষে ১। ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের, বর্ত্তমান বর্ষের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হয় এবং বর্ত্তমান বর্ষে ১৫ই আষাঢ় (২৯এ জুন) লোয়ার সার্কুলার রোড গবর্মেণ্ট গোরস্থানে মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভের উপর পুষ্পমাল্য প্রদান এবং কবির স্মৃতির উদ্দেশে প্রার্থনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়।

প্রতিষ্ঠা-উৎসব—আলোচ্য বর্ষে স্থানাভাববশতঃ পরিষদের প্রতিষ্ঠা উৎসবের আয়োজন করা হয় নাই।

কার্য্যালয়—সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার; সহকারী সভাপতি—মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী; সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; সহকারী সম্পাদক—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল; কোষাধ্যক্ষ—কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্ত্তমান সময়ে সকল দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ কর্ম্মচারিগণের অভাব আংশিক লাঘব করিবার জন্য (ক) সকলেরই বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে, (খ) সকল ক্ষেত্রেই কিছু কিছু মাসিক ভাতা দেওয়া হইয়াছে এবং (গ) পূজার সময় এক মাসের বেতন অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৩০৲ বা তন্নিম্ন বেতনভোগীদিগকে একখানি করিয়া ধুতি ও পিয়নদের সকলকে একটি করিয়া জামা দেওয়া হইয়াছে। পরিষদেব কর্ম্মচারী শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল কার্য্য ত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে উক্ত পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি—নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন—(ক) সদস্যগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত—

১। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৪। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৫। রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, এস-জে, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৭। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৮। কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, ৯। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ১০। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১১। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৩। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৪। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৫। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৭। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ১৯। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ২০। প্রফুল্লকুমার সরকার, পরলোক গমনের পর শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার। (খ) শাখা-পরিষদের নির্ব্বাচিত—২১। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২২। শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন, ২৪। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক। (গ) কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে—২৫। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৬। শ্রীরাধানাথ দাস।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির মন্তব্য গৃহীত ও সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,—১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) কমলা লেক্চারশিপ সমিতিতে ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২। জগত্তারিণী পদক সমিতিতে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, (গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চার নির্ব্বাচন সমিতিতে শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (ঘ) সরোজিনী পদক-সমিতিতে শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও (ঙ) লীলা দেবী পুরস্কার সমিতি ও লীলা দেবী লেকচারশিপ সমিতিতে শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। আগামী মাঘ মাসে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের শত-বার্ষিক জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

৩। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল—

(ক) সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা, (খ) আয়-ব্যয়, (গ) পুস্তকালয়, (ঘ) চিত্র-শালা, (ঙ) ছাপাখানা, (চ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন এবং (ছ) প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি।

রমেশ-ভবন—আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের সম্পূর্ণ দ্বিতল গবর্মেণ্ট রেশনিং অফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

(ক) চুঁচুড়ার অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র সেনের দুইখানি, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ১২খানি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২খানি এবং কৃষ্ণদাস পালের ১০খানি স্বহস্তলিখিত পত্র এবং (খ) শ্রীহরিহর শেঠ চন্দননগরের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানাদির নক্‌সা ও চিত্র মোট ১২খানি চিত্রশালায় দান করিয়াছেন।

বাঙ্গালার লাট-পত্নী শ্রীযুক্তা কেসি লাট-ভবনে (২৬ এপ্রিল হইতে ৩ মে ১৯৪৫) প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহাতে পরিষদের কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তর ও ধাতু-মূর্তি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

পুথিশালা—আলোচ্য বর্ষে পুথিশালায় মাত্র ৪ চারিখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানি উপহার দিয়াছেন শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা মণ্ডল। অপর তিনখানি পুরাতন পত্ররাশি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত টীকাসমন্বিত বাঙ্গালা পুথি একখানি এবং সংস্কৃত পুথি তিনখানি। এই চারিখানি পুথি তালিকাভুক্ত করিয়া বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—বাঙ্গালা ৩২৪৬, সংস্কৃত ২০৯৪, তিব্বতী ২৪৪, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া ৪, হিন্দী ২, ফার্সী ১৩—মোট ৫৯০৬।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৩১৬ খানি পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুস্তকালয়-সমিতির নির্দ্দেশ-মত ক্রীত ২০৫ খানি ও উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত ১১১ খানি। ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য,—১। রামমোহন রায় (রবীন্দ্রনাথ) ১ম সং, ২। ঔপনিষদ ব্রহ্ম (ঐ), ৩। সুরুচির কুটীর (দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়) ১২৯১, ৪। এই এক প্রহসন, ১২৮৮, ৫। প্রাণকৃষ্ণ ঔষধাবলী ১ম সং (প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস), ৬।

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ), ৭। রোমের ইতিহাস ১ম সং, (ভূদেব), ১৮৬৯, ৮। বিদ্রোহ ১ম সং, ১২৯৭, ৯। হুগলীর ইমামবাড়ী ১ম সং, ১২৯৪, ১০। ভারতী ১২৮৬।

যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,— ১। Bengal Library, ২। Archaeological Survey of India, ৩। Smithsonian Institution, ৪। Geological Survey of India, ৫। Manager of Publication, Delhi, ৬। কর্ম্মসচিব বিশ্বভারতী, ৭। Manager, Asutosh Library.

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থাদি ক্রয় করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। পরিষৎ কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট এই জন্য কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের জন্য নিম্নোক্ত নিয়ম গৃহীত হইয়াছে—পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে পুস্তক আদান-প্রদান করিতে হইলে বিশিষ্ট-সদস্য ও আজীবন-সদস্য ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর সদস্যকেই আগামী ২রা বৈশাখ ১৩৫২ হইতে পরিষৎকার্য্যালয়ে পাঁচ টাকা জমা রাখিতে হইবে।

বিশেষ বিধি—যে সকল সদস্য বার্ষিক ১২৲ বারো টাকা বা তদূর্দ্ধ টাকা চাঁদা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে গ্রন্থাগারে ৫৲ আমানত জমা দেওয়ার নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলির গ্রন্থকারানুসারিণী তালিকা প্রণয়নের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রকাশ—(ক) সাধারণ তহবিল হইতে—(১) আলোচ্য বর্ষে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় নিম্নোক্তসংখ্যক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—৪৬। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৭। নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, ৪৮। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং ৫০। রাজকৃষ্ণ রায়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-রচিত ৪৯ সংখ্যক গ্রন্থ 'রাজনারায়ণ বসু' যন্ত্রস্থ। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, অনেকগুলির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

(২) ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু-রচিত 'স্বপ্ন' গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩-৪) স্থির হইয়াছে যে, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রচিত 'শকুন্তলা'র এক প্রামাণিক সংস্করণ এবং টেকচাঁদ ঠাকুর-রচিত 'আলালের ঘরের দুলালে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হইবে।

(খ) ঝাড়গ্রামরাজ-গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে—(১) বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর অন্তর্গত চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, রাধারাণী, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং কৃষ্ণকান্তের উইলের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪) রামমোহন রায়ের 'সহমরণ'বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'চারি প্রশ্ন' বিষয়ক আলোচনার মুদ্রণ চলিতেছে।

ঝাড়গ্রাম-রাজগ্রন্থপ্রকাশ তহবিলভুক্ত উক্ত গ্রন্থগুলির সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস। বর্ষমধ্যে এই তহবিলভুক্ত গ্রন্থগুলির বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিদধিক ২৬২৫০৲ পাওয়া গিয়াছিল, গ্রন্থমুদ্রণাদির ব্যয় বাদে ১৩,৮০০৲ টাকার কিছু বেশী উদ্‌বৃত্ত আছে এবং প্রায় ২৫৯০০৲ মূল্যের গ্রন্থ মজুদ আছে।

(গ) লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল।—চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নিঃশেষিত হওয়ায় শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় এবং এই তহবিলের অর্থে উহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হইবে। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে।

(ঘ) 'সাহিত্য-নিকেতন' হইতে প্রকাশিত এবং পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত 'বাংলার কবি ও কাব্য' গ্রন্থমালায় "ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়" শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—একপঞ্চাশত্তম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রথম-দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-চতুর্থ—এই দুইটি যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ নিয়ন্ত্রণের ফলে পত্রিকার কলেবর সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে। চারি সংখ্যায় এই কয় শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে,—ইতিহাস—৮, ভাষাতত্ত্ব—২, প্রাচীন সাহিত্য—১ এবং বিবিধ বিষয়ে ২টি প্রবন্ধ।

বঙ্গীয় রাজসরকার—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন—আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত করপোরেশন পরিষদ্‌ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম শর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এবং পুস্তকালয় ও চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী ব্রজমোহন দাস বাবাজীকে (অধুনা পরলোকগত) এককালীন ৫০৲ সাহায্য করা হইয়াছিল। এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য যে সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিক্রয় করিয়াও কিছু অর্থাগম হইয়াছে।

স্মৃতিরক্ষা—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্তের সৌজন্যে এবং শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় (ক) অক্ষয়কুমার দত্ত ও (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তৈলচিত্র দান করিয়াছেন।

বঙ্কিম-ভবন—আলোচ্য বর্ষে কাঁটালপাড়াস্থ বঙ্কিম-ভবনের সংরক্ষণ তহবিলে ৪২৷৶৬ আয় হইয়াছে। এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষের শেষে ৮৫১৷৶৭ উদ্বৃত্ত আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটী-শাখার তত্ত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, শিবপুর, রাঁচী, কাশী, ভাগলপুর, নৈহাটী, বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও কাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর শাখায় যথারীতি অধিবেশনাদি হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসে নৈহাটী শাখা-পরিষদের আয়োজনে বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর তমলুকে নূতন শাখা-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আসিয়াছে।

বিশেষ দান—আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের নিকট হইতে ১০০৲ এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের নিকট হইতে ১৫০৲ দান পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আয়-ব্যয়—পরিষদের ১৩৫১ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়ের বিবরণ এবং উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) সদস্যগণের নিকট পূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে চাঁদা, প্রবেশিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় বাবদ আয় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী সযত্নে সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

উপসংহার—বিগত পাঁচ বৎসর দেশের অতিশয় দুঃসময়ে রাষ্ট্রীয় বহুবিধ বিপর্য্যয়ের মধ্যে আমি আমার সহকর্ম্মীদের সাহায্যে ও দেশবাসীর সহানুভূতির মধ্যে যথাসাধ্য আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি। যে আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে আমরা কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম, ভগবানের কৃপায় এই দুর্দ্দিনেও তাহা অতিক্রম করিয়া একটা আর্থিক দৃঢ় ভিত্তির উপর ইহাকে দাঁড় করাইতে পারিয়াছি। আশা করি, বাঙালী জাতির এই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক প্রতিষ্ঠানটি অতঃপর উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া ভারতবর্ষেরও গৌরব হইয়া উঠিবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
বঙ্গাব্দ ১৩৫২,
৬ আশ্বিন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫২শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
১৩৫২

বাংলা-সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ-অবদান

ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া

প্রত্যেক দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, সমাজ কিম্বা পরিবারের এমন এক সময় আসে, যখন আমরা জানিতে চাহি, ইহার কোন ঐতিহ্য আছে কি না, যাহা ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছে। ঐতিহ্য মাত্রের দুইটি দিক্ আছে। ইহার ভিতরের দিক্ সংস্কৃতি বা কৃষ্টি, যাহাকে আমরা ইংরেজীতে বলি কালচার। ইহার বাহিরের দিক্ সভ্যতা বা সিভিলাইজেশন্। চিন্তা, কল্পনা, ভাবধারা, ধর্ম্মবিশ্বাস এবং যাবতীয় জ্ঞান-সম্পদ্ সংস্কৃতির অন্তর্গত। ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, এবং যাবতীয় জাতীয়, রাষ্ট্রীয় এবং ধার্ম্মিক প্রতিষ্ঠান লইয়াই সভ্যতা। সংস্কৃতি ঐতিহ্যের অধ্যাত্ম রূপ এবং সভ্যতা ইহার স্থায়ী বাহ্য রূপ। সংস্কৃতিতে আছে, নব নব আদর্শ রূপের উদ্ভাবনী শক্তি এবং সভ্যতায় পাই অভিনব নির্ম্মাণ-কৌশল। যেমন একদিকে সংস্কৃতিতে দেখি, অধ্যাত্মজীবনের উৎস এবং প্রবাহ, তেমন অপর দিকে সভ্যতায় পাই ইহার যথার্থ প্রকাশ, পরিচয় ও নিদর্শন। ঐতিহাসিক, সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখিয়া উঁহাদের সাহায্যে অধ্যাত্মজীবনের প্রগতির ধারা ও ক্রম, স্বরূপ ও আকার নির্ণয় করিতে যান। শুধু তাহাতেও বিচক্ষণতা দেখাইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয় না, উপযুক্ত কারণ সহ সৃষ্টির উৎকর্ষ অপকর্ষ দেখানও তাঁহার বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে। মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে যথার্থ সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করিতে হইলে ধীরতা ও বিজ্ঞতার সহিত নানা দিক্ হইতে বিচার ও নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক—কোথায়, কখন এবং কাহার দ্বারা কি ভাবে, কি পরিমাণে ও কিরূপ স্তরে তাহা উন্নীত হইয়াছে এবং তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষও বা কিরূপে ঘটিয়াছে। নচেৎ কবিতা লিখিয়া জন-সমাজে প্রকাশ করিলেই কবি হইলেন, যা তা লিখিয়া ছাপাইলেই লেখক ও সাহিত্যিক হইলেন, তুলী হাতে নিলেই চিত্রকর হইলেন, ধর্ম্মকথা বলিলেই ধর্ম্মকথিক হইলেন অথবা দুই চারিটী ঘোরে আলাপ করিতে পারিলেই দার্শনিক হইলেন ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হয়। ইহাতে শুধু প্রশ্রয় দেওয়া হয় পল্লবগ্রাহিতাকে এবং হেয় করা হয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রকৃত সাধকের জীবনব্যাপী সাধনাকে।

অবশ্য এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই নহে যে, সব ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে বিচারের সমান মাপকাঠি। প্রগতির ধারায় এই মাপকাঠিরও পরিবর্ত্তন হয়, হইয়াছে, হইতেছে, হইবেই। আমি এমন কথাও বলিতে চাহি না যে, বনানীর মধ্যে শুধু বনস্পতিই জন্মাইবে ও বিরাজিত থাকিবে, এবং অপর কোন উদ্ভিদ ও গুল্মলতার আপন আপন ভাবে ও শক্তিতে জন্মিবার ও বিরাজ করিবার অধিকার থাকিবে না। আমি জানি, বনানীর বহু উদ্ভিদ্-পরিবারের মধ্যে

বিরাজ করিয়াই বনস্পতির মহত্ত্ব, মর্যাদা ও গৌরব। কবি শশাঙ্কমোহনের ভাষায় বলিতে গেলে, সহস্র জন কবিতা রচনা করিলেও "কবি হয় একজন" এবং শত জন হাতে তুলী ধরিলেও চিত্রকর হয় একজন। যেমন একদিকে বনস্পতি লইয়াই বনানীর মর্যাদা, তেমন অপর দিকে বনানীর সমষ্টিগত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের গৌরব প্রকাশ করিয়াই বনস্পতির জীবন ধন্য। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভাষায় বলিতে গেলে,

"শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় সকল সে শৌখিন মজদুরি।
... ...
সাহিত্যের ঐক্যতান-সংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়।"

আমার শুধু বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে দেশ, জাতি, সম্প্রদায় অথবা সমাজ যতই নব নব আদর্শ রূপ রচনা করিয়া অগ্রসর হইতে পারে, ততই তাহা প্রগতিশীল।

বাংলা-সাহিত্যে বৌদ্ধগণের উল্লেখযোগ্য কোন দান আছে কি না এবং থাকিলে তাহার গতি ও প্রকৃতি কিরূপ, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। প্রশ্নটী তুলিয়াছেন চট্টলের প্রাচীন পুথির তালিকা-সংগ্রাহক শ্রদ্ধাস্পদ মৌলবী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় মাসিকপত্র ভারতবর্ষে। "মঘা খমুজা"ই আধুনিক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বৌদ্ধগ্রন্থ। ইহা একটী অনুবাদ-গ্রন্থ, যাহাতে মূলগ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। বাংলার বৌদ্ধগণের নিকট "মঘা" শব্দের পারিভাষিক অর্থ বর্ম্মিজ অক্ষরে লিখিত এবং পালি কিম্বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় রচিত বৌদ্ধ-শাস্ত্রগ্রন্থ। শব্দটী সংস্কৃতিগত, জাতিবাচক নহে, যেমন মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নাথগুরুদের নাম অধ্যাত্মসাধনাসূচক, জাতিসূচক নহে। "মঘা খমুজা" পুস্তকের পুথির পরিচয় দিতে গিয়া আব্দুল করিম সাহেব বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বড়ুয়াদের জাতিগত কতকগুলি অবান্তর কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ উক্ত মাসিকপত্রে তাঁহার বিবৃতির প্রতিবাদ করি নাই। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত স্নেহবশতঃ বাংলাভাষায় বড়ুয়াদের সাহিত্যচর্চ্চাপ্রসঙ্গে কর্ণফুলীর উত্তর কূলে আমার এবং দক্ষিণ কূলে বন্ধুবর ৺গজেন্দ্র-লাল চৌধুরীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জানিতেন না যে, পালি মজ্‌ঝিমনিকায়ের প্রথম খণ্ডের অনুবাদক আমি এবং বেস্‌সন্তরজাতকের অনুবাদক গজেন্দ্রলাল, এই দুইয়ের মধ্যে কেহই বাংলাভাষায় বড় সাহিত্যিক নহি। বাংলায় বড়ুয়াদের মধ্যে যাঁহারা যশস্বী লেখক, কবি কিম্বা সাহিত্যিক, তাঁহাদের কাহারও নাম তিনি ভুলক্রমেও করেন নাই।

যদি আমরা "মঘা খমুজা"কে বাংলা ভাষায় আদি বৌদ্ধগ্রন্থ মনে করি, তাহা হইলে ইহার রচনাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ এক শতাব্দী অতীত হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যে এই শত বর্ষের বৌদ্ধ অবদানকে "গুরু-ঠাকুরী", "বিদ্যাসাগরী", "নবীনসেনী", "নবং" এবং "পাশ্চাত্য"—প্রধানতঃ এই পাঁচ-যুগপর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক যুগপর্য্যায়ে আদি, অন্ত ও

মধ্য, এই তিন যুগক্রম কল্পনা করা চলে। গুরু ঠাকুরী ও নবযুগের মধ্যে পণ্ডিত ৺ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া, পণ্ডিত ৺নবরাজ বড়ুয়া, স্বর্গত অগ্‌গসার মহাস্থবির, ডাক্তার ৺রামচন্দ্র বড়ুয়া এবং কবি ৺সর্ব্বানন্দ বড়ুয়ার আবির্ভাব হয়। নবরাজের জন্মস্থান বৈদ্যপাড়া গ্রাম, অগ্‌গসারের জন্মস্থান হোয়ারাপাড়া এবং অপর তিন জনের জন্মস্থান আবুরখিল গ্রাম। তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার রামচন্দ্র বড়ুয়ার জন্ম ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে, এবং মৃত্যু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর, রবিবার ; পণ্ডিত ধর্ম্মরাজের জন্ম ১২২২ মঘীর (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের) ১০ই কার্ত্তিক এবং মৃত্যু ১২৩৬ মঘী (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের) ১লা চৈত্র, রবিবার ; এবং কবি সর্ব্বানন্দের জন্ম ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস এবং মৃত্যু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল (২রা বৈশাখ)। ডাক্তার রামচন্দ্র পঁচাত্তর বৎসর বয়সে, পণ্ডিত ধর্ম্মরাজ মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে যক্ষ্মারোগে এবং কবি সর্ব্বানন্দ মাত্র আটত্রিশ বৎসর বয়সে কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। বৌদ্ধসমাজে ধর্ম্মরাজের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী খ্যাতনামা বৌদ্ধগ্রন্থপ্রণেতা নোয়াপাড়া গ্রামবাসী স্বর্গত ফুলচন্দ্র বড়ুয়া এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী লেখক বৈদ্যপাড়াগ্রামবাসী স্বর্গত পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া। ফুলচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বড়ুয়াদের মধ্যে জনৈক অল্পপ্রতিভাশালী কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, "মঘা খমুজা", যাঁহার রচনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নাম ধাম কিছুই এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, যদিও তাঁহার আবির্ভাবকাল ফুলচন্দ্রের আবির্ভাব-কালের খুবই কাছাকাছি। সম্ভবতঃ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা জাতির মধ্যে প্রচলিত ও সমাদৃত সাতটী "গোজেনের লামা"ই আধুনিক যুগে বাংলায় বৌদ্ধসমাজের প্রথম উপাদেয় পালা-গান, যাহাতে পুরাতন "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা"র ধারা কিছু না কিছু রক্ষিত আছে বলিয়া মনে হয়। নবরাজ পণ্ডিতের জন্ম ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি এবং মৃত্যু মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী। অগগসারের উপসম্পদা (ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ) ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং দেহত্যাগ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে। রামচন্দ্র ও অগ্‌গসারের জীবন যেমন দীর্ঘ, তেমনই কর্ম্মবহুল ও ঘটনাবহুল। অপর তিন জনের জীবন দীর্ঘ না হইলেও অমূল্য। বাংলায় বৌদ্ধগ্রন্থপ্রণেতারূপে ধর্ম্মরাজ পাঁচ জনের মধ্যে সকলেরই পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সর্ব্বানন্দ সকলেরই পরবর্ত্তী।

"নীতিরত্ন", "বৌদ্ধালঙ্কার", "শিক্ষাসার", "প্রকৃত সুখী কে?" "প্রাথমিক বৌদ্ধশিক্ষা", "প্রসন্নজিতোপাখ্যান" ও "পালি ব্যাকরণ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া-বিরচিত "বুদ্ধ-পরিচয়ে"র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা অংশে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির লিখিয়াছেন, "ছাত্রবৃত্তি পড়িবার সময় হইতেই তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের বিকাশ হইতে থাকে। 'সদ্ভাবশতক' তাঁহাদের পাঠ্য ছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন সুযোগ্য ৺আচার্য্য কালীশ্বর গুপ্ত তাঁহাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারই সৎশিক্ষাপ্রভাবে এবং 'সদ্ভাবশতক' পাঠে বালক নবরাজ বাক্‌সংযম ও সত্যভাষণে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট ছিল। এখন এই সৎগুরুপ্রভাবে তাঁহার ধার্ম্মিক হইবার বাসনা বাড়িয়া গেল। এই সময়ই তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ

৺কাশীমোহন মুন্সির সহায়তায় 'উবুকশীল' নামে বৌদ্ধদের নিত্যাবশ্যকীয় একটি পুস্তিকা প্রচার করেন।" এই পরিচয়ের মধ্যে কোথায়ও ভুলক্রমে পণ্ডিত ধর্ম্মরাজের অথবা ফুলচন্দ্র বড়ুয়ার উল্লেখ করা হয় নাই।

ধর্ম্মরাজ, নবরাজ, অগ্গসার, রামচন্দ্র এবং সর্ব্বানন্দ জীবিতকাল হিসাবে সমসাময়িক হইলেও বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থপ্রণেতারূপে ধর্ম্মরাজ শুধু যে নবরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নহে; তিনি বহুগুণে শক্তিশালী এবং দক্ষ লেখকও বটেন। তাঁহাদের দুই জনেরই আদর্শ চরিত্র, সদ্ধর্ম্মে গভীর আস্থা এবং গ্রন্থ রচনায় ও কার্যে উভয়েই লোকশিক্ষক। পণ্ডিত নবরাজের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে, "সাধু নবরাজ যে বিশ্বাসপূত নীরব জীবনের আভাস দিয়া গিয়াছেন, ঐরূপ জীবনের পরিচয় অল্প স্থানেই পাইয়াছি। মুখে কথা নাই, হাতে কাজ আছে, বাহিরে কোন আড়ম্বর নাই, অন্তরে বিশ্বাস ভক্তি জমিয়া জমিয়া শান্তিনিকেতনে পরিণত হইতেছে, সংসারের প্রতি আসক্তি বা স্পৃহা নাই, অন্তরে মহাবৈরাগ্যের উদার চরিত্র পবিত্র ও উজ্জ্বল হইতেছে। কঠোর আত্মসংযমে মহাদেবত্বের অভ্যুদয় হইতেছে—ইহা দেখিয়াছি শুধু নবরাজের অস্ফুট মহাজীবনে। অস্ফুট বলি এই জন্য—তাহা ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু নিয়তির অলজ্ঘ্য বিধানে সম্যক্‌রূপে ফুটে নাই। জাগিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সম্যক্‌রূপে জাগিতে পারে নাই।" নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হইলেও এজাতীয় মন্তব্য কম-বেশী দুই-চারিজনের পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে। তবে নবরাজকৃত "বুদ্ধ-পরিচয়ে"র উপসংহারে তিনি যে 'আত্ম-নিবেদন' রচনা করিয়াছেন, তাহা এই বিংশ শতাব্দীর পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত সেকেলে, নিতান্ত মেয়েলী, পাঁচমিশুলী ও বেমানান। ইহার প্রথম সাতটি শ্লোকে আছে শুধু সদ্য বিধবার বৈষ্ণবী বিরহবিলাপ।

"কোথা গেলে ওহে প্রভু বুদ্ধ ভগবান!
এ দাসেরে সঙ্গী কেন না কৈলে তখন?
সে কালে আমার কথা কেন না স্মরিলে?
কিরূপে থাকিব আমি এই ভবানলে!
তুমিই ত মম প্রভু জীবনের ধন।
সে ধন বিহনে কিসে ধরিব জীবন!
কি হবে আমার গতি ওহে দয়াময়?
ডুবে গেল শোক দুঃখে এ মম হৃদয়।
হায় রে! এ মুখে আর বাক্য নাহি সরে।
মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়ে যেন গেল চির তরে।"

ইহার ৮ম ও ৯ম শ্লোকে ঋষিপ্রব্রজ্যা ও ভিক্ষু-প্রব্রজ্যার মধ্যে আচারগত গোলযোগ ঘটিয়াছে।

"কাষায় বসন কবে করিয়া ধারণ।
নগর নগরান্তরে করিব ভ্রমণ!

বন্য ফলমূলে করে জীবন তোষিব।
ভিক্ষা হেতু দ্বারে দ্বারে কখনি ভ্রমিব॥"

কিন্তু পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে দেখা যাইবে, উহার মধ্যে বৌদ্ধভাবধারার কেমন এক সুন্দর অভিব্যক্তি আছে।

"পর্ব্বতকন্দরে কিম্বা গহন কানন।
সিংহ ব্যাঘ্র সনে কবে হইবে মিলন!
তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্ম করিয়া কীর্ত্তন।
দেশ দেশান্তরে কবে হবে তৃপ্ত মন॥"

তালপুট স্থবির তাঁহার অতুলনীয় প্রাচীন গীতিগাথার প্রথম দুই গাথায় বৈরাগ্যসূচক খেদোক্তি করিয়াছেন :—

কদা নু'হং পব্বতকন্দরাসু একাকিয়ো অদ্দুতিয়ো বিহস্সং
অনিচ্চতো সব্বভবং বিপস্সং—তং মে ইদং তং নু কদা ভবিস্সতি!
কদা নু'হং ভিন্নপটন্ধরো মুনি কাসাববত্থো অমমো নিরাসযো
রাগঞ্চ দোসঞ্চ তথেব মোহং হন্ত্বা সুখী পবনগতো বিহস্সং।
"কদা আমি পর্ব্বতকন্দরে একা অদ্বিতীয় করিব বিহার
অনিত্য সকল ভব হেরি—
সে মোর এ' শুভদিন, তাও যে কবে হবে!
কদা আমি ছিন্নপট্টধারী মুনি কাষায়বসন অমম নিরাশয়
রাগ দ্বেষ তথা মোহ নাশি' সুখী উপবনগত করিব বিহার।"

উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয়টিতে বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকবি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের দেশবিখ্যাত "বুদ্ধদেবচরিত" নাটকের "চল ভাই দেশ বিদেশে ঘরে ঘরে করি গান" পদযুক্ত শেষ গানটির প্রতিধ্বনি আছে।

আবুরখিল গ্রামের দক্ষিণ ঢাকাখালী পল্লীবাসী কালীচরণ ও পরমার পঞ্চম বা সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মরাজ তাঁহার সময়ে শুধু বৌদ্ধসমাজে নয়, সারা বাংলা দেশে পালি ভাষায় ও সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বাংলা ভাষায়ও তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল, শব্দসম্পদ্‌ও অসাধারণ। নবরাজের ন্যায় তিনি বাল্যে ও কৈশোরে একজন কৃতী ছাত্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। সে কালের পক্ষে ইংরাজী ভাষায়ও তাঁহার অধিকার কম ছিল না। তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতে নির্ব্বাচন-পরীক্ষা না দিয়া পালি ভাষা ও ত্রিপিটক অধ্যয়নের জন্য সিংহলে যান এবং তথায় দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল ঐ ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেন। পরে স্বদেশে ফিরিয়াও কলিকাতা হইতেই পাথেয়ের পক্ষে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া, উক্ত বিষয়ে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শ্যামরাজ্যে গমন করেন এবং সেখানে পালি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নে তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়া স্বদেশে ও স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ কিম্বা সাতাশ বৎসর মাত্র। ঐ বৎসরেই

পাঁচখাইন গ্রামের ৺ কাশীনাথ বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যা নবকুমারীর সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন হইতেই তিনি বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হন।

ধর্ম্মরাজকৃত প্রথম বৌদ্ধ গ্রন্থ 'সূত্র নিপাত' পালি সুত্ত-নিপাতের "সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ"রূপে ২৪৩০ বুদ্ধাব্দে, ১২৪৮ মগাব্দে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থ "ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত" পূর্ব্বোক্ত "মঘা খমুজা"রই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও মার্জিত বাংলা সংস্করণ। তৃতীয় গ্রন্থ "সিঙ্গালকসুত্ত" পালি সিঙ্গালোবাদসুত্তেরই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত সংস্করণ এবং শেষ গ্রন্থ "সিঙ্গালকসূত্র" উহারই বাংলা অনুবাদ, যাহা ১২৫১ মগাব্দে, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ গ্রন্থ "হস্তসার", ১ম ভাগ, ২৪৩৬ বুদ্ধাব্দে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এবং ২৪৭৯ বুদ্ধাব্দে, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ম্মুদ্রিত হয়। পঞ্চম গ্রন্থ "শ্যামাবতী" পালি উদেনবথু অবলম্বনে রচিত। ষষ্ঠ গ্রন্থ "জ্ঞানসোপান", উহার পাণ্ডুলিপি মূল গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর হস্তগত করিয়া আবুরখিলবাসী জনৈক ভিক্ষু "জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানসোপান" নাম দিয়া নিজের নামেই ছাপাইয়াছিলেন। সপ্তম গ্রন্থ "সত্যসার", অষ্টম গ্রন্থ "হস্তসার" ২য় ভাগ, নবম গ্রন্থ "হস্তসার" ৩য় ভাগ এবং দশম গ্রন্থ "মাতৃদেবী"। ইহাদের কোনটীই মুদ্রিত হয় নাই এবং পাণ্ডুলিপিও উধাও হইয়াছে।

পালিভাষায় ধর্ম্মরাজের কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং বাংলা সাহিত্যেই বা তাঁহার চিরস্থায়ী দান কি, তাহা বিচার করিতে গেলে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ সুত্ত-নিপাতের পদ্যানুবাদ "সূত্র-নিপাত"ই যথেষ্ট। অধুনা শ্রীমৎ ভিক্ষু শীলভদ্র উহার যে গদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তাহা মূলের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারে নাই। পালি ত্রিপিটকের মধ্যে সুত্তনিপাতের ন্যায় শক্ত বই নাই বলিলেও চলে। সাবলীল গতিতে মূলের শব্দবিন্যাস ও অর্থ বজায় রাখিয়া সুত্তনিপাত পদ্যে ভাষান্তরিত করা দুরূহ কাজ, তাহা ধর্ম্মরাজ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। পয়ার, একান্তর মিল পয়ার, লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘত্রিপদী, এই চারিটী ছন্দের ব্যবহার যেমন ধর্ম্মরাজের এই পদ্যানুবাদে, তেমন তাঁহার অন্যান্য রচনাতে। বলা অনাবশ্যক যে, কবি সর্ব্বানন্দের পূর্ব্বে "গোজেনের লামা" ব্যতীত অপর সকল বৌদ্ধ রচনার মধ্যে মাত্র এই চারিটী ছন্দেরই ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শূন্যপুরাণ, ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি ও ধর্ম্মমঙ্গলজাতীয় বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের রচনার ধারাই যেন চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণের রচনার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে।

সুত্তনিপাতের পদ্যানুবাদে যে ভাবে ধর্ম্মরাজের অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে প্রশংসার্হ কবিত্বশক্তিও প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহা প্রদত্ত নমুনাগুলি হইতে সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

১। সুন্দরিকভারদ্বাজসূত্র (পয়ার)

ভগবান্ বলে,—'অতএব হে ব্রাহ্মণ।
তোমাকে শিখাব ধর্ম্ম, কর হে শ্রবণ॥

গোত্রের বিষয় না করিবে জিজ্ঞাসন।
জিজ্ঞাসিবে বিষয় কেবল আচরণ ॥
সত্য বটে কাষ্ঠ হতে অগ্নি উৎপাদন।
হীন কুলে জন্মে হেন শিষ্ট মুনি জন ॥

২। সভিয়সূত্র (পয়ার)

নমো নমো নমো আর্য্য নমো নরোত্তম।
সুরনরলোকে নাহি কেহ তব সম ॥
তুমি বুদ্ধ তুমি শাস্তা তুমি মারজিত।
তুমি মুনি বিশ্বত্রাতা ভুবনবিদিত ॥
তৃষ্ণার ছেদনে তুমি হয়ে নিজে পার।
হাতে ধরি জ্ঞাতিগণে করিতেছ পার ॥
ভবে পুনর্জ্জন্ম হেতু পদার্থনিচয়।
তুমি মহাবীর হস্তে সব হৈল ক্ষয় ॥
রিপুগণ তব হস্তে পাইল বিলয়।
নরমধ্যে নরসিংহ তুমি মহাশয় ॥
নির্ম্মল কমলে নীর না লাগে যেমন।
ভালমন্দে লিপ্ত তুমি না হও কখন ॥

৩। শেলসূত্র (লঘু ত্রিপদী)

যিনি ভাগ্যবান্, যিনি যশস্বান্,
শ্রীমান্ যে মহাজন।
আমার ভবন, সশিষ্যে ব্রাহ্মণ!
করিয়াছি নিমন্ত্রণ ॥
ওহে মাননীয়, জটিল কেনিয়,
বল কি হে তুমি।
"হাঁ গো ওহে শেল, বলি হেন বোল,
তিনিই পরম বুদ্ধ ॥
তবে মনে শেল, ভবে উপজিল,
চিন্তা করে মনে মন।
'বুদ্ধ' এই রব, ত্রিভবে উদ্ভব,
হয়ে থাকে কদাচন ॥"

৪। ব্রাহ্মণ ধাম্মিকসূত্র (দীর্ঘত্রিপদী)

বলিল ব্রাহ্মণগণ, "রীতিনীতি পুরাতন,
ব্রাহ্মণগণের ছিল যাহা।

যদি নহে কষ্টকর, হে গৌতম বিশ্বেশ্বর,
বর্ণনা করুন শুনি তাহা ॥
পুরাতন ঋষিগণ, করি আত্ম-সংযমন,
করি আরো তপঃ আচরণ।
পঞ্চেন্দ্রিয়ামোদ সার, করি সবে পরিহার,
আত্মসুখ করিত চিন্তন ॥
পশু আদি ধান্য ধন, না ছিল কাঞ্চন ধন,
পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ সদনে।
ধ্যান ছিল ধান্য ধন, ধ্যানই পরম ধন,
রক্ষিত যা অতীব যতনে ॥
প্রস্তুত করিয়া অন্ন, ভিক্ষুকে প্রদান জন্য,
রাখিত গৃহস্থ দরজায়।
জানি তাহা দ্বিজগণ, বিশ্বাস করিয়া মন,
গ্রহণ করিত সবে তায় ॥
বিবিধ বরণ বাস, নানাবর্ণ শয্যাবাস,
সহ দেশবাসী নরগণ।
সমস্ত প্রদেশবাসী, ধনবান্‌গণ আসি',
করিত সে ব্রাহ্মণ পূজন ॥
অবধ্য অদমনীয়, অজেয় অলঙ্ঘনীয়,
ছিল পূর্ব্বতন দ্বিজগণ।
গিয়া কার দরজায়, ব্রাহ্মণ যদি দাঁড়ায়,
নাহি বিরোধিত কোন জন ॥"

ধনিয়সুত্ত সুত্তনিপাতের অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট সূত্র, ইহার ভাষা সহজ সরল সুন্দর অথচ গভীর ভাবদ্যোতক এবং ইহা এ দেশের প্রাচীন পল্লীজীবনের শান্ত ও সুখদ চিত্রাবহ। ধর্ম্ম-রাজের অনুবাদের পর এই সূত্রের আরও তিনটি পদ্য অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ১৩১৫ সালের আষাঢ়-সংখ্যা "ভারতী" পত্রিকায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার দ্বিতীয় অনুবাদ প্রকাশ করিলে প্রথম বর্ষ "জগজ্জ্যোতিঃ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় উহার তীব্র সমালোচনা হয় এবং তৃতীয় সংখ্যায় স্বর্গত কবিধ্বজ গুণালঙ্কার মহাস্থবির উহার তৃতীয় অনুবাদ এবং "তরুণ বৌদ্ধ" পত্রিকায় রাঙ্গুনিয়া ঘাটচেক গ্রামবাসী শ্রীমান্ মুনীন্দ্রপ্রিয় তালুকদার, এম্ বি, উহার চতুর্থ বা শেষ অনুবাদ প্রকাশ করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, শেষোক্ত দুই অনুবাদে আমার যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা ছিল। প্রথম ও তৃতীয় অনুবাদের কিয়দংশ তুলনা করিলে দুইয়ের পার্থক্য জানা যাইবে।

সুত্রের তৃতীয় গাথার অনুবাদ :—

(১) ধর্ম্মরাজকৃত :—

ধনীয় গোপাল কহে সম্বোধি' আকাশ।
গোচারণে জন্মিয়াছে আশাতীত ঘাস॥
নাহি তথা মশক দংশক উপদ্রব।
নিরাপদে বিচরণ করে গাভী সব॥
যদ্যপি কখন হয় বৃষ্টি বরিষণ।
অক্লেশে সহিতে পারে মম গাভীগণ॥
অতএব, হে আকাশ! শুন হে বচন।
ইচ্ছা হয় যদি তব কর হে বর্ষণ!

(২) গুণালঙ্কারকৃত :—

ধনিয় গোপ :—

"অন্ধক মশক নাহি হেথা নদীতীরে,
জাত তৃণে গরুগুলি চরিয়া বিচরে।
আসিলেও বৃষ্টি এরা করিবে সহন,
যদি চাও দেব তুমি বরিষ এখন।"

বাসিষ্ঠসুত্রের মধ্যে লোকপ্রসিদ্ধ ধর্মপদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণবর্গের বহু গাথা আছে। ধর্ম্মরাজের "সুত্র-নিপাত" গ্রন্থে আমরা উহাদের প্রথম আদর্শ পদ্যানুবাদ পাই। পরবর্ত্তী কালে কবি সর্ব্বানন্দ, দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র, পার্ব্বত্যচট্টগ্রামের অবসরপ্রাপ্ত জেলা স্কুল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুচ্ছুদ্দী (মুৎসুদ্দি) এবং ফেণী কলেজের পালি-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বড়ুয়া-প্রমুখ অনেকেই পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। উহার গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন সুলেখক চারুচন্দ্র বসু মহাশয়। ইংরেজী ভাষায় জেমস্ গ্রে ও মোক্ষমুলর-প্রমুখ বহু কৃতী পুরুষ উহার গদ্য অনুবাদ প্রকাশ করিলেও বর্ত্তমানে উড্‌ওয়ার্ড-কৃত পদ্যানুবাদই সব চেয়ে সমাদৃত। ধর্ম্মপদের বাঞ্ছিত গদ্যানুবাদ এখনও সম্ভব হয় নাই। ধর্ম্মরাজকৃত দুইটি গাথার অনুবাদ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি :—

অক্রোধী যে জন, সাধুকর্ম্মবিভূষিত।
শান্ত, দান্ত, ধাম্মিক, বাসনা-বিবর্জ্জিত॥
চরম শরীর যিনি কোরেছে ধারণ।
তাঁহাকেই বলি আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ॥
পদ্মপত্রে জলবিন্দু লিপ্ত যেন নয়।
সূচ্যগ্রে সর্ষপ যেন স্থির নাহি হয়॥
এতাদৃশ কামভোগে নির্লিপ্ত যে জন।
তাঁহাকেই বলি আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ॥

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, ধর্ম্মরাজের "ধর্ম্ম পুরাবৃত্ত" পূর্ব্ববর্ত্তী "মঘা থমুজা"রই পরবর্ত্তী মার্জ্জিত বাংলা সংস্করণ। একদিন ছিল, যখন চট্টলবাসী বৌদ্ধগণের ঘরে ঘরে উহার পুথি ছিল এবং তাহা অতি সমাদরে পঠিত হইত। ইহার ঐতিহাসিক বিশেষত্ব এই যে, প্রথমতঃ, আরাকানরাজের আধিপত্যের আমল হইতে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম যে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং এখনও যাহা তিরোহিত হয় নাই, তাহার এক নিখুঁত চিত্র তাহাতে আছে। দ্বিতীয়তঃ, উহারই রচনার মধ্যে আমরা বর্ম্মা ভাষা ত্যাগ করিয়া বাংলা ভাষায় মঘা মাগধী বা পালি ভাষায় নিবদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থসমূহকে প্রকাশ করিবার মূল প্রচেষ্টা দেখি। সাহিত্যবিশারদ মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব উহার মাত্র একখানি পুথির দুখানি পাতা পাইয়াছেন। আমার কাছে ইহার তিনখানি পুথি আছে। মদীয় পূজ্যপাদ শিক্ষক স্বর্গত ধর্ম্মবংশ মহাস্থবিরের সংগ্রহ হইতে যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহা ১২১২ মগাব্দে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। ধর্ম্মরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী "গুরুঠাকুরী" যুগের ইহাই পূর্ব্বোক্ত চারি ছন্দে বাংলায় আদি বৌদ্ধ রচনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ। থমুজা বম্মিজ শব্দেরই বাংলা বানান, ইহার অনুযায়ী পালি শব্দ অপদান বা অবদান। বিবিধ পুণ্যানুষ্ঠানের বিভিন্ন সুফল বর্ণনা করিয়া লোকসমাজকে পুণ্যকার্যে উৎসাহিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে গভীর জ্ঞানের কথা কিছুই নাই। ইহার ভণিতা অংশ হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময়ে স্থানীয় বৌদ্ধগণের বিশ্বাস ছিল যে, বাড়বকুণ্ডের সান্নিধ্যে পবিত্র চন্দ্রনাথ পাহাড়ে নাগরাজ বাসুকি ভগবান্ বুদ্ধের এক কেশধাতু আনিয়া উহার উপর এক চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বদেশ অনুপাম, চাটিগ্রাম যার নাম (১)
চন্দ্রশীকর সেই স্থান।
সেই গিরিতে (২) পুণ্য যথ, তাহা না কহিব কথ,
[বর্ণনাতে না হয় বাখান (৩)]॥
নিকটে দাবের কুণ্ড (৪), অগ্নি জলে প্রচণ্ড,
তাতে স্নান করে নর লোকে।
যেই জলে করে স্নান, সেই পাএ পরিত্রাণ,
দেবলোকে জাএ মনসুখে (৫)॥
আর এক আছে হ্রদ, প্রবেশে পাতাল পথ,
মারুত উঠএ বহুশএ।
পূর্ব্বে জেদি দ্বিজ দানা থমুজাতে আছে জানা,
বিস্তারিয়া বঙ্গালাতে কহে॥

১। পাঠান্তর, চাটিগ্রাম রাষ্ট্র নাম। ২। গীরিতে। ৩। আদর্শ পুথি, পূর্ব্বে ছিল শিল-কাজা। পাঠান্তর, পূর্ব্বে দিল কায়াভাগ করি। ৪। বারবকুণ্ড। ৫। আদর্শ পুথি মনহুখে।

দ্বিজ দানা পদতলে,　　তথা বশী আছে চুলে (১),
　　অস্তি (২) সব করি দিল ভাগ (৩)।
শিরে (৫) এক রাখি ছিল,　　ইন্দ্র তাহা হরি নিল,
　　এই তক্ত (৪) জানিল সব নাগ।
তবে ত বাসুকি ফণি (৫),　　হ্রদ করি' মেদনি (৬),
　　দ্বিজ থাকি (৬) দন্ত হরি নিল।
নিআ সে বাসুকিরাজ,　　মনে মনে চিন্তে কাজ,
　　"চুন্দা" নামে সেই জেদি (৭) দিল।
সেই ত হইআছে হ্রদ　　জানে (৮) সবে শাস্ত্র মত,
　　শ্রবণেতে অমৃতের গাথা।

প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে "ওঁ নমঃ গনেশাঅ, নমঃ সরস্বতি, অথ মঘা থমুজা পুস্তক লীখ্যতে" বলিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। প্রারম্ভে তিনি 'প্রভু নিরঞ্জন'কে প্রণাম করিয়াছেন, যিনি ত্রিভুবনের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কারণ। এই নিরঞ্জন প্রভু বুদ্ধ নহেন, ইনি পরমেশ্বর; যিনি ব্রহ্মারূপে প্রজা সৃজন, বিষ্ণুরূপে পালন ও শিবরূপে সংহার করেন। তিনি সাংখ্য-প্রকৃতির রজোগুণে বিশ্বের সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি ও তমোগুণে বিনাশ সাধন করেন। গ্রন্থের উপসংহার অংশে লিখিত আছে :

"ধন জন সব মিছা, সত্য কিছু নএ।
মিছা কাজে লোক সবে মোর মোর কএ।
জীবন কুসুম ফুল সম্পদ নিস্ফল।
মিছা কাজে লোক সব হৈআছে পাগল।
বুজীআ চাহত সবে হএ কি না হএ।
মঘা ভাসা ভাঙ্গিআ বাঙ্গালা ভাসে কএ।
থমুজার ধর্ম্মকথা অমৃতের ধার।
হএ কি না হএ চাহ করিআ বিচার॥

"শুকঠাকুরী" যুগে "মঘা থমুজা"র অজ্ঞাত রচয়িতার অব্যবহিত পরেই যশস্বী লেখক ফুলচন্দ্রের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার জন্মস্থান আবুরখিলের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত নোয়াপাড়া গ্রাম, যাহা কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেনের এবং 'বাল্মীকির জয়' ও The cosmic dust লেখক ৺রজনীকান্ত সেনের জন্মে ধন্য হইয়াছে। ফুলচন্দ্র প্রথম জীবনে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া প্রৌঢ়ে গৃহী হইয়াছিলেন। পালি ও বাংলা, এই দুই ভাষায় সমান অধিকার লইয়া তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত ঐ অন্ধকার-যুগে এ দেশে দ্বিতীয় আর কেহ ছিল না।

১। থাএত রাখিয়াছিলে। দানা দ্রোণ। ২। অস্থি। পাঠান্তর, যার সব। ৩। সীমে। ৪। তক্ত= তত্ত্ব। ৫। ফণী। ৬। মেদিনী। ৭। চৈত্য। ৮। জান।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁর রূপে গুণে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, ব্যক্তিত্বে চরিত্রে, ধর্ম্মপ্রাণতায় ও দূরদর্শিতায় অলোকসামান্যা পত্নী অক্ষয়কীর্তি রাণী কালিন্দী ১৮৪৪ সালে "মৃত স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তির সরবরাহকারিণী"র পদ লাভ করিলেন। তিনি চট্টগ্রামের সংঘ-সংস্কারক আরাকান-বাসী সংঘরাজ ও হাবুবাঙর কৃতী গুণামেঝর অথবা কৃতবিদ্য হরি (হারিচাঁদ ?) ঠাকুরের শ্রীমুখে "সম্বুদ্ধের চরিতামৃতকাহিনী" শুনিয়া সদ্ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনি "বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য ১২৭৬ বাঙ্গালার ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ চৈত্র দিবসে" পাহাড়তলী গ্রামে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত মহামুনির অনুকরণে উত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজনগরে শ্রীশ্রীশাক্যমুনিবিগ্রহ স্থাপন করিয়া, তাহা এক অপূর্ব্ব পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করিলেন। সর্ব্বাগ্রে বড়ুয়াদের মধ্যে প্রচলিত বর্ম্মিজ অক্ষরে লিখিত এবং দুর্ব্বোধ্য বর্ম্মিজ অন্বয় (অনেক্) যুক্ত বা বিযুক্ত সতেরটী পালি সূত্ত সংগ্রহ করাইয়া তিনি বর্ম্মিজ হইতে ঈষৎ রূপান্তরিত চাকমা অক্ষরে লিখাইলেন। ঐ সংগ্রহই চাকমা বৌদ্ধ সমাজে "আগর তারা" নামে পরিচিত ও সমাদৃত হইল। তার পর তিনি ভাবিলেন, কি উপায়ে রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায়[১] নিত্য পাঠ করিতে পারে, বাংলায় এরূপ অমিয়বুদ্ধচরিত রচনা করাইয়া বিতরণ করা যায়। এই দুরূহ কার্যের জন্য ফুলচন্দ্রের নামোল্লেখ হইলে তিনি তাঁহাকে স্বগ্রাম হইতে ডাকাইয়া আনিলেন। পালি ধাতুবংসের সরল পদ্যানুবাদ করাই স্থির হইল। উহার রচনাকার্যে ফুলচন্দ্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এবং বেতাগী গ্রামবাসী সহৃদয় নীলকমল দাস গণেশের কার্য করিলেন। অনুবাদ-গ্রন্থকে "বৌদ্ধরঞ্জিকা" নাম দেওয়া হইল। কেহ কেহ বলেন, ফুলচন্দ্রের গদ্য অনুবাদ এবং নীলকমলের পদ্যরচনার ফলেই "বৌদ্ধরঞ্জিকা" রচিত হয়, যাহা চট্টগ্রামবাসী বড়ুয়াদের ঘরে ঘরে "তাধুয়াইং পুথি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং যাহার সামান্য সামান্য ভিন্নপাঠযুক্ত বহু পাণ্ডুলিপি বড়ুয়া ও চাকমা সমাজ হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। রাণী কালিন্দীর একান্ত বাসনা ছিল, তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এই অমিয়বুদ্ধচরিত ছাপাইয়া উহার এক হাজার কপি বিতরণ করিয়া যাইবেন। তাঁহার সে মহদিচ্ছা উত্তরকালে তাঁহার পৌত্র সদ্ধর্ম্মসেবী ভুবনমোহন রায় কতকাংশে পূর্ণ করিয়াছিলেন। "চাকমা জাতি"র কৃতী লেখক সতীশচন্দ্র ঘোষের ভাষায় বলিতে গেলে "ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্মবিবরণ হইতে ধর্ম্মপ্রচার, নির্ব্বাণ ঘোষণা এবং পরিশেষে প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের উপর যাবতীয় ভার ন্যস্ত করিয়া তিরোভাব ইত্যাদি সমুদয় কথা সরল পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে।"

রচনা হিসাবে "বৌদ্ধরঞ্জিকা" অনেকাংশে উন্নত হইলেও তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী "মঘা থমুজা"রই ধুরবাহী ; ইহাতেও সেই চারিটী ছন্দের প্রাচুর্য। ইহার লঘুত্রিপদীতে রচিত "কল্পতরুর বর্ণনা" যেমন সরল ও সুন্দর, তেমনই কবিত্বব্যঞ্জক :—

১। পুরাকালেও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতের পরিবর্ত্তে জাতক গ্রন্থ এবং বাল্মীকির রামায়ণের পরিবর্ত্তে বেস্সন্তর জাতক রচিত হইয়াছিল।

"তরু মনোহর, দেখিতে সুন্দর, কাঞ্চন সদৃশ অঙ্গ।
বহু পল্লবিত, অতি সুশোভিত, বিহঙ্গাদি করে রঙ্গ ॥
কুসুম সৌরভে, অলি মধুলোভে, পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে কথ।
কুকিলে কুহরে, ময়ুরি ময়ুরে, বিহরয়ে অবিরত ॥
সরসি সারসে, আছে রঙ্গরসে, শামাপাখি কত শত।
সারীসুক সুখে, বিরহে কৌতুকে, সংখ্যা বা করিব কত ॥"

"মঘা খমুজা" এবং "বৌদ্ধরঞ্জিকা" এই দুই পূর্ব্বযুগের বাংলা বৌদ্ধগ্রন্থের প্রধান অপূর্ণতার মধ্যে আমরা দেখি, বর্ম্মিজ উচ্চারণ-বিকৃত পালি নাম ও পরিভাষাগুলি তাহাতে আছে, যথা—আনন্দের স্থানে 'আনাইংদা', চেতিয়র (চৈত্যের) স্থানে 'জেদি', মহাথেরর স্থানে ম্মাথে, কস্সপর (কাশ্যপর) স্থানে খাচবা, ককুচ্ছন্দর (ককুৎসন্ধর) স্থানে খাকুচান্দ।

ঐ যুগে ফুলচন্দ্র কবিত্বের সহিত ভিক্খু পাতিমোক্খের গদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন, যাহা পাদিমুখ নামে পরিচিত ও আদৃত হয়। পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত গুরামন ঠাকুর (গৌরমোহন তালুকদার) তাঁহার ১২৪৯ মগাব্দে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এক পুথিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ফুলচন্দ্র পাহাড়তলী মহানন্দ বিহারে বসিয়া "পাদিমুখ" প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন[১]। পরে চট্টল বৌদ্ধসমাজের নেতৃস্থানীয় পূজ্যপাদ হরগোবিন্দ মুচ্ছদ্দী ও পাহাড়তলীবাসী পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বড়ুয়া একত্রে উহার এক মার্জ্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও তাঁহার "বুদ্ধদেবচরিত" গ্রন্থে পাতিমোক্খের সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ সকল প্রচেষ্টার পূর্ণ পরিণতি হয় ধীরপ্রজ্ঞ পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য-সঙ্কলিত ভিক্খু ও ভিক্খুনীপাতিমোক্খে। ফুলচন্দ্রের অনুবাদের দোষ হইল, তিনি পালি শব্দের উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা দিতে পারেন নাই, নচেৎ তিনি যাঁহাদের জন্য লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের বহু উপকারে আসিয়াছিল। উদ্ধৃত নমুনা হইতে তাঁহার গদ্যরচনার পরিচয় মিলিবে :—

"৪১। গ্রাস মুখের দ্বারের নিকট নেওয়ার পূর্ব্বে হাক্ করিবে না। ৪২। মুখে গ্রাস দিবার সময় অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিবে না। ৪৩। মুখে গ্রাস দিয়া কথা কহিবে না। ৪৪। মুখে গ্রাস ক্ষেপণ করিয়া খাইবে না।"

ধর্ম্মরাজকৃত 'হস্তসার' ১ম ভাগ, নিত্যপাঠ্য গ্রন্থরূপে বাংলার প্রতি বৌদ্ধগৃহে স্থান পাইয়াছিল। ত্রিশরণ, পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল, মঙ্গলসূত্র, রত্নসূত্র ও করণীয় মৈত্রীসূত্র প্রভৃতি বৌদ্ধগৃহস্থের উপযোগী পাঠ ও সূত্রসমূহ সান্বয় ব্যাখ্যা এবং সরল গদ্য ও পদ্যানুবাদ সহ উহাতে সন্নিবেশিত ছিল। এই 'হস্তসার' পড়িয়া বাংলার বৌদ্ধ নরনারী তাঁহাদের অবশ্য-প্রতিপাল্য ধর্ম্মের মহিমা ও উন্নত নৈতিক আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ইহাতে বৌদ্ধ

১। আবুরখিলবাসী আত্মীয় বিধুভর বড়ুয়াও স্বগ্রামবাসী তিন জন পথপ্রদর্শকের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ফুলচন্দ্রের গুণের কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মরাজের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের গৌরব প্রচারিত হইয়াছিল। যতদিন 'হস্তসার' নামটি থাকিবে, ততদিন ধর্ম্মরাজের পুণ্যস্মৃতি বাংলার বৌদ্ধসমাজে দেদীপ্যমান থাকিবে।

ধর্ম্মরাজের 'হস্তসার' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এবং 'গুরুঠাকুরী' যুগের শেষ ভাগে পাহাড়তলী গ্রামবাসী স্বর্গত শরু পণ্ডিত (শরচ্চন্দ্র বড়ুয়া) পদ্যাকারে 'মহামঙ্গলসূত্র' ছাপাইয়াছিলেন "বৌদ্ধমঙ্গল" নামে। ইনিও ভিক্ষুব্রত ছাড়িয়া পরে গৃহী হইয়াছিলেন। যে বৎসর হস্তসারের প্রথম ভাগ মুদ্রিত হয়, ঐ বৎসরেই অগ্গসার তাঁহার উপাদেয় প্রথম বই "বুদ্ধভজনা" প্রণয়ন করেন। পরবর্ত্তী কালে হস্তসারের অভাব পূরণের জন্য বর্দ্ধিত আকারে সমণপিয়সীলি বহুস্মৃত পুন্নানন্দ সামী রত্নমালা, আন্ধারমাণিকগ্রামবাসী শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভিক্ষু সদ্ধর্ম্মদীপিকা এবং রেঙ্গুন বুদ্ধিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যপাড়াগ্রামবাসী শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির সদ্ধর্ম্মরত্নাকর প্রণয়ন করেন। নবরাজকৃত উবুকশীল এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দিকৃত উপোসথসহচর এই শ্রেণীরই গ্রন্থ। প্রথমোক্ত দুইটী গ্রন্থে আমারও যৎকিঞ্চিৎ সহযোগিতা ছিল। ধর্ম্মরাজ ও নবরাজের শুষ্ক গদ্য রচনা সমস্তই বিদ্যাসাগরী।

ধর্ম্মরাজ-প্রণীত গ্রন্থগুলি পালি সুত্তপিটকের ধারায় বিরচিত হয়। যথা খমুজার ধারা পালি অপদান-সাহিত্যের। বংসজাতীয় সাহিত্যের ধারায় ফুলচন্দ্রের বৌদ্ধরঞ্জিকার এবং বিনয়পিটকের ধারায় পাদিমুখ গ্রন্থের উৎপত্তি। অভিধম্মপিটকের ধারায় এদেশে গ্রন্থ প্রণয়নের পক্ষে রামচন্দ্র ডাক্তারই পথ-প্রদর্শক।

তাঁহার জীবনেতিহাসে আমরা দেখি, আশৈশব সদ্ধর্ম্মে তাঁহার অহৈতুকী রতি, বাল্যে ও কৈশোরে বিদ্যাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য পালন, যৌবনে কবিরাজি ও ডাক্তারীতে অধীতবিদ্যতা, যৌবনে ও প্রৌঢ়ে দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সহিত সামরিক ও সিভিল মেডিক্যাল বিভাগে চাকুরী, ক্রমশঃ পদোন্নতি, বহুদর্শিতা এবং রুগ্ন ও আর্ত্তের চিকিৎসা ও সেবা, এবং বার্দ্ধক্যে ধ্যানসমাধি, সমাজ-সংস্কার, লোকশিক্ষা ও গ্রন্থ-প্রণয়ন। তাঁহার ঋষিতুল্য জীবনে দৃঢ় সঙ্কল্প, বিপুল উৎসাহ, নির্ভীক সৎসাহস, নির্লোভ হৃদয়, পাপবিরত ও প্রলোভনজয়ী চিত্ত, সূক্ষ্ম দর্শন ও দূরপ্রসারী দৃষ্টি ছিল। শ্রামণের ও ভিক্ষু অবস্থায় উপাধ্যায় ফুলচন্দ্র মহাস্থবিরের সান্নিধ্য ও সঙ্গ লাভ এবং কর্ম্মজীবনে বাঙ্গালোরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের চিকিৎসা ও পরিচর্যা, দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধের সময় উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে বিভিন্ন সামরিক হাসপাতালে নির্ভয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন এবং পেলিটুয়ায় অস্থায়ী ভাবে দীর্ঘ সাত বৎসর সিভিল সার্জ্জন ও জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিয়াও ধর্ম্মসাধনার জন্য অকাতরে ঐ উচ্চ পদত্যাগ, উহাদের প্রত্যেকটিই আমাদের কাছে স্মরণীয় অবদান। তিনি তাঁহার জীবনে পর পর বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া কৃতিত্বের সাহত সমস্ত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু সব চেয়ে তাঁহার বড় কৃতিত্ব হইল এই যে, তিনি চরিত্রপরীক্ষায় জয়মাল্য পাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধপ্রধান এবং অভিধর্ম্ম ও ধ্যান শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র ব্রহ্মদেশে যাইতে পারিলে তাঁহার জীবনের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বিশ্বাস করিয়া তিনি রাওলপিণ্ডি হইতে সুযোগ নিয়া তথায়

ট্রান্সফার নিয়াছিলেন। ঐ দেশে তিনি অন্যূন দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অবসর সময়ে বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ও ধ্যানমার্গে উন্নীত সায়াদ(আচার্য্য)গণের সাহচর্য্য লাভ এবং তাঁহাদের সহিত অভিধর্ম্মাদি নিগূঢ় বিষয়ের আলোচনা করিয়া, তাঁহার শেষ কার্য্যস্থান হইয়াছিল আকিয়াবের পার্ব্বত্য মহকুমার প্রধান শহর পেলিটুয়া। এই স্থানে অবস্থানকালেই ইংরাজীতে বিখ্যাত পালি ব্যাকরণ-প্রণেতা ডাক্তার থাড়ুয়াইংএর পিতৃদেবের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন, যিনি আকিয়াবের যেমন অভিধর্ম্মে, তেমনই ধ্যানসমাধিতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারই নিকট কর্ম্মস্থান (ধ্যেয় বিষয়) গ্রহণ করিয়া তিনি কেয়ক্ত পোকতলীর শ্মশানে অনপ্রাণধ্যানে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময়ে পাহাড়তলীবাসী ধ্যানপ্রিয় বিপ্রদাস মুচ্ছুদ্দী এবং সদ্ধর্ম্মসেবী মদীয় পিতৃব্য ধনঞ্জয় তালুকদার তাঁহার বাসাহারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উহারই পরিণতিতে তিনি ক্রমশঃ চাকুরীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া লোভনীয় সরকারী পদ পরিত্যাগ করিয়া অভিধর্ম্ম ও ধ্যানসমাধি বিষয়ে নিপুণতা লাভের জন্য ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন।

রামচন্দ্র তাঁহার স্বগ্রামে অবস্থানকালে পরিণত বয়সে শিশু-চিকিৎসা, বড়ুয়াদের ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে এক একখানি এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত বিষয়ে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "শ্রমণ কর্ত্তব্য" ১২৬৩ মগাব্দে, ১৯৩১ সালে, দ্বিতীয় গ্রন্থ "অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ" ১২৭২ মগাব্দে, ১৯৪১ সালে, তৃতীয় গ্রন্থ "নির্ব্বাণ দর্শন কর্ম্মস্থান" পরবর্ত্তী বর্ষে মুদ্রিত হয়। তাঁহার চতুর্থ গ্রন্থ মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তের বাংলা অনুবাদ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। বিনয়পিটকের ধারায় "শ্রমণ কর্ত্তব্য" এবং অভিধর্ম্ম ও সুত্তপিটকের ধারায় অবশিষ্ট বইগুলি লিখিত হয়।

অভিধর্ম্ম ও ধ্যানসমাধি মনোবিজ্ঞানসম্মত ও নীতি-প্রধান হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের অতি নিগূঢ় ও জটিল বিষয়। মূল অভিধর্ম্মপিটকের বইগুলি দেখিলে মনে হইবে, যেন উহাতে কতকগুলি দুরূহ শব্দের বিন্যাস ও সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নাই। পারিভাষিক শব্দের তালিকার পর পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা চলিয়াছে অর্থনির্দ্দেশ বা অর্থবিভাগ। এহেন জটিল বিষয়গুলিকে বাংলার পাঠকগণের নিকট সুবোধ্য করিবার দুঃসাহস লইয়াই রামচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়নকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যেমন সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, তেমন সম্পূর্ণ নিষ্ফলও হয় নাই। প্রতি চেষ্টার ইতিহাসে প্রগতির ক্রম আছে। তাঁহার অকৃতকার্য্যতাও ক্রমে আমাদিগকে কৃতকার্য্যতার পথে আনিয়াছে। তাঁহার প্রধান ব্যর্থতার কারণ ছিল, পালি পরিভাষার অনুযায়ী বাংলা পরিভাষার অভাব। এই ব্যর্থতা আলোচ্য বিষয়ের তাৎপর্য্য নহে, তাহা উহার বিশদ আলোচনায় ও খুঁটিনাটিতে।

সতিপট্‌ঠানের অনুযায়ী বাংলা শব্দ স্মৃতি-প্রস্থান কিংবা স্মৃতি-উপস্থান। ইহা বুদ্ধ-উপদিষ্ট ধ্যানযোগের ব্যাকরণ। অনপ্রাণ সাধনার মূল প্রাণায়াম অভ্যাস। পূর্ব্বাচরিত প্রাণায়ামের মধ্যে বুদ্ধ যোগ করিলেন—স্মৃতির অনুশীলন। যখন যাহা করিতেছি, যখন যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, অনুভব করিতেছি, চিন্তা করিতেছি, যখন যাহা উৎপন্ন হইতেছে,

তখনই তাহা সেই সেই ভাবেই জানিতে হইবে। কাজেই এই স্মৃতির সহিত যুক্ত আছে অপর একটি প্রয়োজনীয় শব্দ, যথা—সম্প্রজ্ঞান, অর্থাৎ যথাযথ জানা। জহুরী সহজে রত্ন চিনিতে পারেন। বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর বিহার ও সভার প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবিরের অনুরোধে আমি ছাত্রাবস্থায় সতিপট্‌ঠানসুত্তের যে সামান্য অনুবাদ পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলাম, অনায়াসে তাহার সারমর্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন শ্রেষ্ঠ অজপা নামসাধক, বিজয়কৃষ্ণের একান্ত অনুগত শিষ্য, অমূল্য "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুপ্রসঙ্গ"-প্রণেতা স্বনামধন্য ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ।

পালি অভিধর্ম্ম সাহিত্যের চরম পারিভাষিক গ্রন্থ আচার্য্য অনুরুদ্ধকৃত অভিধম্মত্থসঙ্গহ। ইহাকে আশ্রয় করিয়া সিংহলে পোরাণ টীকা ও বিভাবনী টীকা প্রণীত হয় এবং পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মদেশে এক বিরাট্ অভিধর্ম্ম-সাহিত্য গড়িয়া উঠে। আধুনিক যুগে ইহার শেষ স্বাধীন ভাষ্যকার ব্রহ্মদেশের বিশ্ববিশ্রুত বৌদ্ধাচার্য্য লেডিসড, যিনি মগ্‌গঙ্গদীপনী প্রভৃতি বহু মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা। গভীর গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা ও টীকা টিপ্পনী সহ ইংরেজী ভাষায় উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া লেডিসডের শিষ্যস্থানীয় আরাকানবাসী সোয়েজান অঙ্গ মরিয়াও অমর হইয়াছেন। পালি টেক্‌ষ্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ অধ্যাপক রীজ্ ডেভিড্‌সের বিদুষী পত্নী মিসেস্ রীজ্ ডেভিড্‌সই অভিধর্ম্মনিহিত বৌদ্ধ চিন্তা ও জ্ঞানের প্রচারের পক্ষে প্রতীচ্যে পথ-প্রদর্শক। রামচন্দ্রের পর প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি অনেকাংশে সুবোধ্য করিয়া অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু রামচন্দ্রই ত এ বিষয়ে বাংলায় পথ-প্রদর্শক। মুৎসুদ্দি মহাশয়ও এতটা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিতেন না, যদি তিনি ব্রহ্মদেশে থাকিয়া পালি ও বর্মিজ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ না করিতেন এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত অভিধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ'ও সন্দর্ভগুলি অধ্যয়ন করিতে না পারিতেন। লেডিসড-প্রণীত মগ্‌গঙ্গদীপনী প্রভৃতি দু একটি বইএর ছায়ামাত্র অবলম্বনে আকিয়াবের চিকিৎসাব্যবসায়ী বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া বাংলা ভাষায় "আর্য্যাষ্টাঙ্গিকমার্গ" নাম দিয়া একটি ছোট বই ছাপাইয়াছিলেন। যদিও তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, পুস্তকনিহিত তত্ত্বকথাগুলি তাঁহার ধ্যানলব্ধ জ্ঞান, বস্তুতঃ তাহা অলীক না হইলেও নিতান্ত আস্পর্দ্ধার কথা।

পালি অভিধর্ম্ম-সাহিত্যে যাহা এখন আমরা দর্শনশাস্ত্র বা ম্যাটাফিজিক বলিয়া জানি, তাহার অতি অল্পই আছে। অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ-বর্ণিত শমথ ও বিদর্শন ভাবনা ঠিক দার্শনিক চিন্তা নহে, যেহেতু তাহাতে যুক্তিতর্কের অবতারণা নাই, অধ্যাত্মসাধনাই ইহার উদ্দেশ্য। পালি অভিধর্ম্মের চারি বিষয়বস্তু, যথা—চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্ব্বাণ।

মনোবিজ্ঞানসম্মত অর্থেই অভিধর্ম্মের পরমার্থ। ইহাতে আছে বিশ্লেষণ ও অনেকগুলি 'ধরাবাঁধা' কথা, উহাদের যথার্থ দার্শনিক বিচার নাই বলিলেও চলে।

যেমন ভগবদ্গীতায় প্রকৃতির তম ও রজোগুণ অতিক্রম করিয়া এবং উহার সত্ত্বগুণ বাড়াইয়া অধ্যাত্মযোগসাধন দ্বারা আপন চরিত্র গঠন ও সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পুরুষকে প্রকৃতির সান্নিধ্য হইতে মুক্ত করিবার কথা আছে অথবা জৈনশাস্ত্রে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর গুণস্থানে

আরোহণ করিয়া ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ, এই চারিটি কষায় ও কর্ম্মক্লেশ হইতে আত্মাকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা আছে, তেমনই পালি অভিধর্ম্মে লোভ, দ্বেষ ও মোহ, এই তিন অকুশল মূল হইতে চিত্তকে বিমুক্ত করিয়া, কুশলমূল ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া, না-দুঃখ না-সুখ বেদনার পথে চিত্তকে চালিত করিয়া, শমথ বা যাবতীয় ক্লেশের উপশম সাধন করা এবং সকল জাগতিক বস্তুর অনিত্যতা, দুঃখ ও অসারতা দেখিয়া বিদর্শন ভাবনার পথে চালিত করিয়া, যাহাতে চিত্ত কিছুতেই ক্লেশ ও অকুশলের অভিমুখী হইতে না পারে, তাহার সদুপায় বিধান করা। চব্বিশটি প্রত্যয় বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধের ভাবে চিত্ত চৈতসিক এবং নামরূপের জটিল ও স্থূলসূক্ষ্ম সম্বন্ধগুলি অনুভব করিয়া এবং জ্ঞানতঃ বুঝিয়া যে যে সম্বন্ধে আমরা সুখদুঃখ ও কুশলাকুশলের অধীন হই, ঐ সকল সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া, যে যে সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত, স্বভাব ও চরিত্র অধোগমনের পথে না গিয়া উর্দ্ধগামী ও সমুন্নত হয়, তাহার মনোবিজ্ঞানসম্মত ও ধ্যানসুলভ উপায় দ্বারা তদনুযায়ী ইন্দ্রিয় ও বলগুলির উৎকর্ষ সাধন করা। আভিধম্মিক রামচন্দ্রের আবহাওয়া "গুরুঠাকুরী", রচনা "বিদ্যাসাগরী" এবং ভাষা বহু স্থানে দুরূহ, তথাপি তাঁহার মূল বক্তব্য বিষয়গুলি অস্পষ্ট নহে[১]।

সুদর্শন বিহার ও পালি টোলের প্রতিষ্ঠাতা অগ্‌গসার মহাস্থবিরের তথা চট্টগ্রাম শহরের বৌদ্ধবিহার-প্রতিষ্ঠাতা নীরব কর্ম্মী ও উদারচেতা ভগীরথ ডাক্তারের জন্মে হোয়ারাপাড়া গ্রাম ধন্য হইয়াছে। "বুদ্ধভজনা" প্রকাশের পর অগ্‌গসার তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ সানুবাদ "গাথাসংগ্রহ" সঙ্কলন করেন ১২৫৬ মগাব্দে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা অর্থ সহ তৃতীয় গ্রন্থ পালি শব্দসংগ্রহ প্রণীত হয় ১২৬০ মগাব্দে, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। চতুর্থ গ্রন্থ সিংহলী পূজাবলীর গদ্যানুবাদের রচনাকাল ১২৭৫ মগাব্দ, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ। এবং পঞ্চম গ্রন্থ সানুবাদ ধম্মপদ-অট্‌ঠকথার সঙ্কলন কাল ১২৭৮ মগাব্দ, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। বলা আবশ্যক যে, অগ্‌গসারের রচনাও সর্ব্বাংশে "বিদ্যাসাগরী"। এ স্থলে পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বড়ুয়াকৃত "প্রেতসূত্র"ও উল্লেখযোগ্য।

প্রগতির ধারায় ফুলচন্দ্রের আরব্ধ কার্য্যের পরিণতির প্রয়োজন ছিল এবং এই বাঞ্ছিত পরিণতি সাধিত হইয়াছে কবি সর্ব্বানন্দের লেখনীতে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় এবং উহাদের পরিবর্ত্তে বাংলার বৌদ্ধগণ প্রত্যহ পাঠ করিতে পারে, এমন এক অমিয়বুদ্ধচরিতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন রাণী কালিন্দী এবং ফুলচন্দ্রের "বৌদ্ধরঞ্জিকা" অনেকাংশে ঐ অভাব দূর করিয়াছিল "গুরুঠাকুরী" যুগে। "বিদ্যাসাগরী" যুগে "বুদ্ধপরিচয়" রচনা করিয়াছিলেন নবরাজ। "নবীন সেনী" যুগে লেখনী হাতে লইলেন সর্ব্বানন্দ, যিনি বহুস্মৃত সমণ পুন্নানন্দের ভাষায় বলিতে গেলে "আমাদের মধ্যে অদ্বিতীয় মনস্বী, কবি ও লেখক।" ইংরেজ কবি সার্ এড্‌উইন্ আর্ণল্ড-বিরচিত "দি লাইট্ অব এসিয়া"র অত্যুৎকৃষ্ট বাংলা পদ্যানুবাদরূপে "জগজ্জ্যোতিঃ" এবং উহারই সাধারণ

১। শেরপুরের জমিদার মদীয় সতীর্থ শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে কৃত পুন্নানন্দ স্বামীর "বিশুদ্ধিমার্গ" সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযুজ্য।

পাঠকের উপযোগী সংস্করণরূপে "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত" রচনার সমৃদ্ধিতে ও গৌরবে সর্ব্বানন্দের কবিপ্রতিভা উদ্ভাসিত হইল। একটি পালি অভিধানের প্রয়োজনও অনুভূত হইয়াছিল। নবরাজ ঐ অভাব মোচনের জন্য অমরকোষের আদর্শে সিংহলদ্বীপে রচিত অভিধানপ্পদীপিকার এক বাংলা সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরে শীলক গ্রামবাসী জ্ঞানানন্দ স্বামী (মহেন্দ্রলাল ভিক্ষু) ২৪৫৭ বুদ্ধাব্দে, ১৯১৩ সালে উহার এক সুন্দর বাংলা সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে শুধু অমরকোষজাতীয় কোষগ্রন্থের দ্বারা অনুভূত অভাব দূর হইবে না দেখিয়া সর্ব্বানন্দ রিচার্ড চিল্ডার্স-কৃত ডিক্সনারী অবলম্বনে পালি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে শব্দগুলি সজ্জিত করিয়া একটি পালি অভিধান প্রণয়ন করেন। "জগজ্জ্যোতিঃ"র পাণ্ডুলিপি সর্ব্বানন্দের সুযোগ্য পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টগ্রামস্থ বুদ্ধিষ্ট অর্ব্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নিকট আমানত রাখিয়া কিছু টাকা কর্জ লইয়াছিল। আমার সংবাদ, বঙ্কিম তাহার দেয় ঋণ পরিশোধ করে নাই, অথচ উক্ত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত পাণ্ডুলিপির সন্ধানও মিলিতেছে না, এ বলে ওর কাছে, সে বলে এর কাছে। পালি অভিধানের পাণ্ডুলিপিও পরহস্তগত হইয়াছে।

দি লাইট্ অব্ এসিয়া এবং দি লাইট্ অব্ দি ওয়ারল্ড নাম দিয়া এডুইন আর্ণল্ড্ যে দুইখানি অমিয়চরিত কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহাদের প্রথমটী বাংলা পদ্যানুবাদরূপেই রচিত হইয়াছিল নবীনচন্দ্র সেনের "অমিতাভ" এবং দ্বিতীয়টীর অনুপ্রেরণায় রচিত হইয়াছিল তাঁহার "অমৃতাভ" বা চৈতন্যচরিত। ভগবান্ বুদ্ধ শুধু এসিয়ার আলো এবং যীশু খ্রীষ্টই জগতের আলো—আর্ণল্ডের এই তুলনাগত প্রভেদে মনোব্যথা পাইয়া সর্ব্বানন্দ "জগজ্জ্যোতিঃ" নাম দিয়াই তাঁহার প্রথমোক্ত চরিতকাব্যের পদ্যানুবাদ করিলেন, যাহার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া নবীনচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বানন্দ, তুমি তোমার জগজ্জ্যোতিঃ লিখিবে জানিলে আমি আমার 'অমিতাভ' লিখিতাম না।"

আর্ণল্ডের "এসিয়ার আলো"র বিষয়বস্তু ও রচনা অতি সুন্দর এবং তাঁহার এই মনোহর চরিতকাব্য পড়িয়া সারা বিশ্বের শিক্ষিত সমাজ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু মূলের তুলনায় সর্ব্বানন্দের অনুবাদ কোন অংশে ন্যূন নহে। ইহাতেও মূলের অনুরূপ শব্দবিন্যাস ও ব্যঞ্জনা, ছন্দের স্বচ্ছন্দ গতি ও মধুর ঝঙ্কার, সারল্য ও গাম্ভীর্য এবং বর্ণনা ও ভাবের চমৎকারিত্ব আছে। তথাপি ইহা অনুবাদগ্রন্থ এবং ইহার ছন্দও মিত্রাক্ষর পয়ার, যদিও তাহা মূলের ধ্বনিতরঙ্গ-হিল্লোলে হিল্লোলিত। আমার বেশ স্মরণ আছে, তিনি তাঁহার অনুবাদগ্রন্থে দীর্ঘ ভূমিকার পরিবর্ত্তে শুধু এই কথাটীই লিখিয়াছিলেন —"সুন্দর বস্তুর ছায়াও সুন্দর।" কথাটীতে বস্তুগত দোষ আছে ; কেন না, সুন্দর বস্তুর ছায়া সুন্দর না হইতেও পারে। উহাতে বস্তুগত দোষ থাকে না, উহা নির্ভুল যদি আমরা তাঁহার ছায়া শব্দে বুঝি আদর্শে প্রতিবিম্বিত চিত্র। ইহাই তাঁহার লক্ষিত অর্থ। এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, তাঁহার উক্তি যথার্থ। যিনি পূর্ণ অর্থাবহ কোন সত্যকে পূর্ণাবয়বে অথচ একটি "ছোট্ট কথায়" এত সুন্দর করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয় 'উঁচুদরের' কবি ও লেখক।

সর্ব্বানন্দ তাঁহার অনুবাদগ্রন্থটিকে তাঁহার স্বর্গত পিতৃদেবের স্মৃতি-অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কাজেই এই উৎসর্গ অংশের কবিতা তাঁহার মৌলিক রচনা। ইহার চরণগুলি ঠিক আমার মনে পড়িতেছে না। তবে তিনি ইহাতে তাঁহার পিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"পিত! তুমি আজ আর নরদেহে বর্ত্তমান নহ। এখন আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বে দেখি (তোমা হেরি বিশ্বময়)। তোমার শুষ্কপ্রায় ডালে এক শাখাপল্লব মঞ্জুরিত হইয়া (মঞ্জুরিল) যে ফুলটী ফুটিল, তাহা তোমারই পবিত্র স্মৃতির অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করিলাম।"

কল্পিত ভাবটী যেমন সুন্দর ও মহান্, ইহার প্রকাশভঙ্গীও তেমন মনোহর। প্রকৃত কবিত্ব না থাকিলে এমন ভাবোদ্দীপক রচনা সম্ভব নহে।

গ্রন্থের উপসংহার অংশের কবিতাও তাঁহার মৌলিক রচনা। ইহাতে তিনি তাঁহার ধৃষ্টতার জন্য ভগবান্ বুদ্ধের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন:

"ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ধৃষ্টতা আমার,
নগণ্য প্রতিভা মম মাপিল তোমার।"

ধৃষ্টতার কারণ এই যে, তাঁহার নগণ্য কবিপ্রতিভা বুদ্ধের অপার করুণার পরিমাণ করিতে গিয়াছে, অর্থাৎ উহার অসীমতা ও অপরিমিততা ঘুচাইয়াছে। কবির এই ক্ষমা ভিক্ষার পশ্চাতে আছে মহাভারতকার ও পুরাণ-উপপুরাণকার ব্যাসপ্রোক্ত দুইটী শ্লোক, যাহাতে তিনিও জগদীশ্বরের নিকট কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার তিন অপরাধ, যেহেতু তিনি তাঁহার ধ্যানে, স্তবস্তুতি ও বর্ণনাবৈচিত্র্যের দ্বারা ভগবানের নিরাকারত্ব, অনির্ব্বচনীয়তা ও সর্ব্বব্যাপিত্ব দূর করিয়াছেন:

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্।

"জগজ্জ্যোতিঃ"র শেষ শ্লোকের প্রথম চরণে কবি নব উষার, অর্থাৎ ভগবান্ বুদ্ধের অপার করুণাসিঞ্চিত ও অতুল মহিমামণ্ডিত ভাবী বিশ্বের, ধীর আগমনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া (হের ওই আসিতেছে উষা), উহার দ্বিতীয় চরণে যেন বেদান্তের ভাবেই বলিতে গিয়াছেন, তখন তাঁহার জীবন অনন্ত সাগরে মিশিয়া যাইবে (মিশে যাবে অনন্ত সাগরে)। কবির এই শেষের উক্তির পশ্চাতেও আর্যভারতের দার্শনিক ঋষিমুখ-বিনিঃসৃত উপনিষদের অমৃতবাণী:

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। (মুণ্ডক, ২-৩-৮)

"শুকঠাকুরী" যুগের "বৌদ্ধরঞ্জিকা"র পূর্ণ পরিণতি "নবীন সেনী" যুগের "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত", যাহার মাত্র প্রথম খণ্ড গ্রন্থকার ছাপাইতে পারিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি খৈয়াখালীগ্রামবাসী শ্রীমৎ রমেশচন্দ্র মহাস্থবির সযত্নে নিজের কাছে

রাখিয়াছেন। বৈষ্ণব গ্রন্থ "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে"র নামানুকরণেই "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত" কাব্যের নামকরণ। কবি সর্ব্বানন্দের "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত" কাব্যে মহাকবি অশ্বঘোষের কাব্যাদর্শ ও ধর্ম্মভাব অতি সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় পরিস্ফুট হইয়াছে, যদিও ইহাতে মাত্র পূর্ব্বোক্ত চারিটি ছন্দেরই ব্যবহার আছে এবং এই কারণে ইহা গুরুঠাকুরী বৌদ্ধরঞ্জিকার সন্ততিই রক্ষা করিয়াছে।

অশ্বঘোষ এবং সর্ব্বানন্দ, দুই বৌদ্ধকবির ভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম মুখ্যতঃ শরণাগতি এবং বুদ্ধ ও বৌদ্ধের মধ্যে উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ। শরণাগতির মূল উৎস ভক্তি অর্থে ভাগবতী তদ্‌গতচিত্ততা, তচ্চিন্তা ও তৎপরায়ণতা। উভয়েই পরাশ্রয়ে, অর্থাৎ ত্রিশরণপ্রভাবে নির্ব্বাণ-মুক্তিকামী। অতএব উভয়ের পশ্চাতে আছে ভগবদ্গীতার শ্রীবাসুদেবোক্ত অধ্যাত্মযোগ ও ভক্তিযোগ। বুদ্ধচরিতে অভিশাপের বালাই নাই, অদৃষ্টবাদিতা নাই, অকুশলমূলতা নাই। সংস্কৃত কবি অশ্বঘোষের ভাবেই বাংলার কবি সর্ব্বানন্দ বোধিসত্ত্বের আবির্ভাবে আদর্শ শাক্যরাজ্যের বর্ণনা দিয়াছেন :—

"শান্তি প্রেমবাক্য আজ, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মাঝ,
সর্ব্বজীবে করে উচ্চারণ।
কটুভাষা নাহি মুখে, সকলে পরম সুখে,
বুদ্ধগুণ করিল কীর্ত্তন॥
শত্রু মিত্র সম হল, শত্রুতা ঘুচিয়া গেল,
শত্রু মিত্র সঙ্গে সমস্বরে।
কাঁপাইয়া নভস্তল, করি সবে কোলাহল,
বুদ্ধগুণ গায় চরাচরে।"

মহাভারত-বর্ণিত যাদব-আদর্শ ও পঞ্চপাণ্ডব-আদর্শের প্রতি বৌদ্ধ জাতককারের নিতান্ত বিরাগ। সে জন্য বাসুদেব বোধিসত্ত্বরূপে সম্মানিত হন নাই এবং কুরুরাজ্যাদর্শের প্রবর্ত্তক যুধিষ্ঠিরগোত্রীয় রাজা অর্জুনকেও কাশীর রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রণয়াসক্ত বিনিন্দিত পঞ্চ পাণ্ডবের অর্জ্জুন হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। কাজেই ঐ দুই আদর্শের উপর খড়্গহস্ত হওয়া আধুনিক বৌদ্ধকবি সর্ব্বানন্দের পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃতে"র সূচনা-ভাগে লিখিয়াছেন :—

"জারজ পাণ্ডববংশ অধর্ম্মী কৌরব,
পানদোষে কলুষিত পাপিষ্ঠ যাদব।
নানাবিধ দোষে দোষী ক্ষত্রিয় সকল,
শুধু শাক্যবংশ ছিল নিষ্পাপ নির্ম্মল।"

তথাপি যেমন রচনা, বর্ণনারীতি ও ভাবের দিক্ হইতে জাতক-সাহিত্যে এবং অশ্বঘোষের কাব্যদ্বয়ে সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণের প্রভাব সুস্পষ্ট, তেমনই সর্ব্বানন্দের বুদ্ধচরিতামৃতের পশ্চাতে আছে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ, যাহা বাংলার বঙ্গভাষাভাষী

বৌদ্ধগণের গৃহে গৃহে পঠিত হইত দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি। নবীন সেনের প্রভাবও অস্পষ্ট নহে। তাঁহার "কাঁপাইয়া নভস্তল" বাক্যের পশ্চাতে আছে "পলাশীর যুদ্ধে"র "কাঁপাইয়া নভস্তল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল"।

প্রাচীন মহাভারতে কৃষ্ণমহিমা কীর্ত্তন এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অবতারবাদের প্রভাবও সর্ব্বানন্দ এড়াইতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

"শুধু লোকশিক্ষা আর সত্ত্ব পরিপাক,
মানব উদ্ধার হেতু নাশিয়া বিপাক,
ভুবনের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া আপনি,
লোকশিক্ষা হেতু শুধু এসেছ ধরণী।"
(শ্রীশ্রীবুদ্ধঃ, ১ম খঃ, পৃঃ ৬৭)

প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যের কোথাও বুদ্ধকে বিশ্বের হর্ত্তা কর্ত্তা বলা হয় নাই ; কারণ, তাহা বৌদ্ধচিন্তার বিপরীত ধারণা। ভগবান্ বুদ্ধ ভুলক্রমেও কৃষ্ণবাসুদেব অথবা প্রভু যীশুর ন্যায় নিজেকে অপরের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া ব্যক্ত করেন নাই ; তিনি শুধু পথ-প্রদর্শক। ঐ যুক্তি আছে গুপ্ত-যুগের মহাভারতের সভাপর্ব্বে (৩৮-২৩) কৃষ্ণ সম্পর্কে :—

কৃষ্ণ এব হি লোকানাং উৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্॥

ইহা নিশ্চিত যে, কবি সর্ব্বানন্দ মহাভারতাদি-প্রভাবিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৌদ্ধতন্ত্র-সাহিত্য হইতেই উদ্ধৃত রচনার অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। প্রমাণস্বরূপে একল্লবীর-চণ্ড-মহারোষণ-তন্ত্রের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহাতে বুদ্ধের মুখে নিম্নোক্ত উক্তিটী দেওয়া হইয়াছে :—

সর্ব্বোঽহং সর্ব্বব্যাপী চ সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বনাশকঃ।
সর্ব্বরূপধরো বুদ্ধো হর্ত্তা কর্ত্তা প্রভুঃ সুখী॥
যেন যেনৈব রূপেণ সত্ত্বা যান্তি বিনেয়তাং।
তেন তেনৈব রূপেণ স্থিতোঽহং লোকহেতবে॥[১]

সর্ব্বানন্দ বাংলায় বুদ্ধ-কীর্ত্তন এবং বৌদ্ধগান রচনা সম্পর্কেও পথ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত" রচনার পূর্ব্ব হইতেই বাংলার বৌদ্ধসমাজে বুদ্ধ-সংকীর্ত্তন ও বৌদ্ধ গান রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ঠেগরপুণি গ্রামবাসী হেক মগধ বেস্‌সন্তরজাতকের উপাখ্যান অবলম্বনে সে কালের যাত্রার ধরণে "উইচান্দ্রা" নাটক লিখিয়াছিলেন গুরুঠাকুরী ভাষায়। উহাতে কয়েকটী গানও সন্নিবেশিত ছিল। পাশ্চাত্যযুগে তাহারই পরিণতিতে পাহাড়তলীবাসী শ্রীমান্ কিরণবিকাশ মুৎসুদ্দি উন্নত ধরণে পঞ্চাঙ্ক নাটক "বেস্‌সন্তর" রচনা

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection, Vol. I, ১৩৪।

করেন, যাহা "সংঘশক্তি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২৫৭ মগাব্দে, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আবুরখিলবাসী আত্মীয় ৺ বিশ্বম্ভর বড়ুয়া অনেকগুলি "বুদ্ধ-সংকীর্ত্তন" রচনা করেন, যাহাদের একটিও মুদ্রিত হয় নাই। চট্টগ্রাম শহরে মাঘোৎসবে গীত ব্রাহ্মসংকীর্ত্তনের প্রভাবে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি ও পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বড়ুয়া কতকগুলি বুদ্ধ-সংকীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাঙ্গুনিয়া গ্রামের গুরুদাস কবিরাজও দুই একটি সংকীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন স্থানীয় কুমোরদের অনুকরণে। বীরেন্দ্র দাদার রচনায় ছিল সঙ্গীতের অভাব ও গদ্যের শুষ্কতা। তাঁহার রচিত এক সংকীর্ত্তনের প্রথম পদ ছিল :

"তোরা আয় রে পুরবাসিগণ, সবে করি বুদ্ধ-সংকীর্ত্তন।"

গোবিন্দচন্দ্রের রচনা কিছুটা সঙ্গীতের অভিমুখী হইলেও, তাহাতে পাই কষ্টকল্পনা ও সোজাসুজি আখ্যানের ভাব। উদাহরণ স্থলে :

"আজি শাক্যসিংহ চলে রে, আজি শাক্যসিংহ চলে রে,
জীবগণের উদ্ধার তরে।
পরিহরি রাজপুরী পিতামাতা সবারে,
মুকুলিতা স্বর্ণলতা দণ্ডসুতা ছেড়ে রে।"

গুরুদাস কবিরাজের রচনায় ছিল বুদ্ধের নাম-মাহাত্ম্য প্রচার, যথা :—

"অঙ্গুলিমাল ব্যাধ ছিল হে,
ওরে নামের গুণে তরে গেল,—কি মধুর নাম!"

ঐ ধারায় মতিলাল দাদা (৺মতিলাল তালুকদার) তাঁহার ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বৌদ্ধধর্ম্মমূলক ক্ষুদ্র দৃশ্যকাব্য "শীলরক্ষিতে"র প্রস্তাবনায় ঈষৎ উন্নত ধরণে নিম্নোদ্ধৃত গান বা কীর্ত্তনটী রচনা করিয়াছিলেন :

"আয় রে ভাই সবে মিলে বুদ্ধনামের গুণ গাই।
বুদ্ধনামে খঞ্জ চলে মৃতদেহে জীবন পাই॥
নিরবাণ সুধার ভাণ্ডার, নিরবাণ শান্তির আগার,
বুদ্ধনামের গুণে চল, সেই নিত্যধামে যাই।
তথা নিত্য শান্তি ভাই,—
রোগ শোক মনস্তাপ তথা নাহি পাই।
ঐ নামতরুর শান্তি-ছায়ায় চল রে জীবন জুড়াই॥"

আমার বিশ্বাস, মতিলাল দাদার দ্বিতীয় গানটিতে হুবহু বীরেন্দ্র দাদার রচিত এক বিশিষ্ট সংকীর্ত্তনের পদগুলির সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে, যথা :—

"এস দয়াময়ে পূজি ভকতি-কুসুম লইয়ে।
হৃদয়ে হৃদয়ে এস রে মিলায়ে পড়ি তাঁর পদে লোটায়ে।
দয়াময় তিনি দয়ার আলয়, বিপদের বন্ধু সম্পদ-আশ্রয়।
শুভ আশীর্ব্বাদ মাগিগে উভয়ে নব প্রেমভূষা পরিয়ে॥

সূর্য্যরশ্মি কিংবা বিমলচন্দ্রিকা নারে আলোকিতে হৃদয়-কণিকা—
পারে শুধু তাঁর কৃপালোকে একা আলোকিতে হৃদি-আলয়ে।
এ আশীর্ব্বাদ কর হৃদয়-রঞ্জন, পেয়ে সুদুর্ল্লভ তনয়-রতন।
পাই যেন মোরা শান্তিনিকেতন যাব যবে ভব ত্যজিয়ে।"

বীরেন্দ্র দাদার "মাগিগে সবাই"র স্থানে "মাগিগে উভয়ে" এবং "ধরম-রতন" স্থানে "তনয়-রতন" বসাইয়াই মতিলাল দাদার গানটী রচিত। বীরেন্দ্র দাদার "পারে শুধু তাঁর কৃপালোকে একা" পদটীর পশ্চাতে ছিল ব্রাহ্মধর্ম্মের "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" সত্যটী। পালি অধ্যাপক শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া তাঁহার এক অভিভাষণে সাতবাড়িয়াবাসী শিক্ষক শ্রীযুক্ত সঞ্জীব চৌধুরীরও কিছু কৃতিত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই অভিমতও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কেহ যদি সাধনরস উৎসারিত করিতেন, তবে কীর্ত্তন অভিব্যঞ্জনার মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিতেন।

শুনিয়াছি, উনাইনপুরবাসী জন্মেজয় পণ্ডিত (শ্রীযুক্ত জন্মেজয় বড়ুয়া) অনেকগুলি বুদ্ধ-সংকীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন। উহাদের নমুনা যাহা পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার রচনার ধরণ অনেকাংশেই "গোবিন্দপণ্ডিতী"। পাহাড়তলীর মোহন মাষ্টার (শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র বড়ুয়া) বুদ্ধের জন্ম, বিবাহ, সন্ন্যাস ও মারবিজয়, এই চারি স্তরে বিন্যস্ত করিয়া স্বরচিত প্রথম খণ্ড "বুদ্ধসংকীর্ত্তন" ছাপাইয়াছেন[১]। তাহা আমার হাতে এখনও আসে নাই। কেবল লোকমুখে জানিতে পারিয়াছি, তাঁহার রচনাভঙ্গী ও সুর সমস্তই বৈষ্ণব ধরণের। বৌদ্ধসঙ্গীতাচার্য পাঁচখাইননিবাসী উপেন্দ্রলাল চৌধুরীও বিভিন্ন সুরে ও রাগ-রাগিণীতে কতকগুলি বৌদ্ধগান বাঁধিয়াছিলেন অনেকটা বাংলা থিয়েটার ও বৈঠকের ধরণে। তাঁহার রচিত গানগুলি বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার অধিবেশনগুলিতে বৌদ্ধ বালকসমিতি দ্বারা প্রায়ই গীত হইত। ডি. এল. রায়ের ধরণে ও সুরে রচিত দুইটী আধুনিক বৌদ্ধ গানের কথা আমি জানি, একটি বীরেন্দ্র দাদার, যাহা "জগজ্জ্যোতিঃ" পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় এবং অপরটি আমার, যাহা "বিশ্ববাণী" পত্রিকার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথমটির প্রথম পদ : "বাজাও সকলে আশার রাগিণী গাও রে সকলে আশার গান" এবং শেষের পদ : "জাগিবে জাগিবে তাহারা জাগিবে হইলে শুধু তারা আগুয়ান।" দ্বিতীয়টীর প্রথম পদ : "উঠিল বিশ্বে সাম্য মন্ত্র গাহিতে সামবেদ।"

আমার চন্দননগর অবস্থানকালে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণ-চন্দ্র দের সনির্বন্ধ অনুরোধে ১৯২৯ সালে পাঁচ ছয়টী বৌদ্ধগান রচনা করি স্বাধীনভাবে। তাহাদের একটি হইল বৌদ্ধ জাগরণগীতি :—

"সুপ্ত ভারতে লুপ্ত গৌরব উঠিল পুনঃ জাগিয়া।
শুভ্র উষার স্নিগ্ধ কিরণ পূরিল বিশ্ব ভাতিয়া॥

১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বড়ুয়া-রচিত "শ্রীশ্রীসিদ্ধার্থচরিতামৃত গীতা", ১ম ভাগ সর্ব্বানন্দের "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত" এবং মোহন মাষ্টারের "বুদ্ধসংকীর্ত্তন" দ্বারা প্রভাবিত।

জয় জয় জয়, ভেরী নিনাদয়, মেদিনী উঠে কাঁপিয়া।
অভয় অভয়, উঠে বিশ্বময়, স্থল-জল-ব্যোম ব্যাপিয়া ॥
ভুবন-চক্রে বায়ু-তরঙ্গ নাচে হিল্লোল তুলিয়া।
গর্জে সিন্ধু নাচে উর্মি কল্লোল সাথে মিলিয়া ॥"

এখন দেখিতেছি, আমার এই বৌদ্ধ জাগরণ-গীতি এবং মতিলাল দাদার গান ও কীর্ত্তন-যুক্ত "শীলরক্ষিত" নাটিকার বিষয়বস্তু সমস্তই সুললিত ভাষা পাইয়াছিল সর্ব্বানন্দের শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃতে, বুদ্ধের মহিমা কীর্ত্তনে—

"কি সুখ সময়, হইল উদয়, অযুত ব্রহ্মাণ্ডে আজ।
নাচে দেবগণ, পুলকিত মন, পরিয়া বিচিত্র সাজ ॥
গেল মৃত্যুভয়, শোকতাপচয়, আনন্দে কাটাব কাল।
মোহ যাবে দূরে, এ ভবসংসারে, ছিড়িবে মায়ার জাল ॥
কিবা শুভদিন, হইল বিলীন, হিংসাদ্বেষ শান্তিজলে।
'অহিংসা' এ বাণী, কি মধুর ধ্বনি, গাইবে সকলে মিলে ॥
কেহ না হিংসিবে, কেহ না কাঁদিবে, সকলে শান্তিতে রবে।
জাতিভেদ দ্বেষ, হইল নিঃশেষ, ভাই ভগ্নী সবে ভবে ॥
নাহিক ঘাতক, সকলি পালক, ঘুচিল শমনভয়।
জয় জয় জয়, শ্রীবুদ্ধের জয়, হিংসা দ্বেষ হ'ল ক্ষয় ॥"

বৌদ্ধ গান ও অধ্যাত্মগীতিগাথার ধারা বহু প্রাচীন। ভারতীয় আর্যসংস্কৃতির ইতিহাসে ঋক্ ও সামের পরেই পালি থের-থেরী গাথার স্থান। এই গীতিগাথাসমূহে তালপুট এবং আম্রপালীর গাথাগুলি সুর তাল ও লয়যুক্ত অধ্যাত্মভাবের গান। আমরা দীঘনিকায়ের সক্কপঞ্‌হ সুত্তে বীণাযোগে স্বর্গীয় গায়ক পঞ্চশিখ-গীত একটি দীর্ঘ দ্ব্যর্থক গান পাই, যাহার প্রথম দুই পদে আছে :—

বন্দে তে পিতরং ভদ্দে তিম্বরুং সুরিয়বচ্চসে,
যেন জাতাসি কল্যাণী আনন্দজননী মম।

যেমন ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরে" বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে বচনগুলির দ্বিবিধ অর্থ, তেমন উদ্ধৃত গানে তিম্বরুপক্ষে ও সদ্ধর্মপক্ষে পদগুলির দুইটী স্বতন্ত্র অর্থ।

আমরা সম্বুলাজাতকে পাই, নির্জনবনস্থিত আশ্রমে বিশ্বের সকলের নিকট শরণভিখারিণী দানবহস্তমুক্তা ও স্বামিপরিত্যক্তা সতী রাজদুহিতা সম্বুলার করুণগীতি :—

সমণে ব্রাহ্মণে বন্দে সম্পন্নচরণে ইসে।
রাজপুত্তং অপস্সন্তী তুম্হম্হি সরণংগতা ॥
বন্দে সীহে চ ব্যগঘে চ যে চ অঞ্‌ঞে বনে মিগা।
রাজপুত্তং অপস্সন্তী তুম্হম্হি সরণংগতা ॥

বন্দে ভাগীরসিং গঙ্গং বসন্তিনং পটিগ্গহং।
রাজপুত্তং অপস্সন্তী তুম্হম্হি সরণংগতা ॥

থের-থেরীগাথার ধারায় বহু শতাব্দী পরে রচিত হয় গবড়া, অরু, গুঞ্জরী, পটমঞ্জরী, দেবক্রী, দেশখ, ভৈরব ও কামোদ ইত্যাদি বিবিধ রাগে দ্ব্যর্থক ও অধ্যাত্মভাবদ্যোতক বহু পাদাচার্যের বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গান, যাহাতে আমরা পাই যেমন একদিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রারম্ভ, তেমনই অপর দিকে হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের আদি। সরহপাদ গুঞ্জরী-রাগে গাহিলেন :—

অপনে রচি রচি ভবনির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥
অম্হে ন জানহুঁ অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেষো ॥ ধ্রুপদ ॥

উড়িষ্যার গড়জাত অঞ্চলের মহিমাধর্মী বৈষ্ণবগণ গুপ্ত মহাযানী বৌদ্ধ কি না বলা শক্ত, কারণ, তাঁহাদের "অর্জুন বুদ্ধ হৈলে জীব, পরম হৈলে কৃষ্ণ" উক্তিতে 'বুদ্ধ' অর্থে বদ্ধ। তবে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর প্রদত্ত পাঠ শুদ্ধ হইলে, তাঁহাদের ভজনগীতিতে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গানের ধারা অব্যাহত আছে বলিতে হয় :—

"চাহি কলিমধ্যরে ভকতে ছন্তি রহি
বুদ্ধ অবতার রূপ দর্শন না পাই।
বিহারমণ্ডলে শূন্যগাদি তুলাইবে
সে অলেখ প্রভু ধুনিকুণ্ডে গুপ্ত নিবে।
মায়ারূপে বুদ্ধ অবতারে নরদেহী
ভক্তজনহিতে ভক্ত উদ্ধারিবে পাই।"

এই ভজনপদগুলির মধ্যেও আমি দেখি, 'বুদ্ধ' শব্দটী বস্তুতঃ 'বদ্ধ', "মায়াবদ্ধ" অর্থেই ব্যবহৃত এবং তাহাতে কৃষ্ণের নরদেহধারী অবতাররূপের কথাই আছে। বুদ্ধের সহিত মায়ারূপের সম্বন্ধ কল্পনা নিতান্ত অবৌদ্ধজনোচিত. আমরা পূর্ব্বে "মঘাথমুজা" আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, প্রভু নিরঞ্জন বা অলেখ বুদ্ধ নহেন; তিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা ঈশ্বর এবং তাঁহার সহিতই প্রকৃতি বা মায়ার সম্বন্ধ। এই সত্যটী প্রাচীন বৌদ্ধগানের ধারায় রচিত সাধু শিবচরণের "গোজেনের লামা"তেও সুস্পষ্ট, যথা :

"গোজেন মেইয়া (ঈশ্বরের মায়া) উদ (অন্ত) নেই,
বুঝি পারি কে ভাই সেই?
পরম বৃক্ষে ভর দিয়া (দেহ ধারণ করিয়া)
বুঝি পারে কে তোর মেইয়া (মায়া)!"

যতই না কেন বৌদ্ধ চিন্তা ও বেদান্তের ধারা একত্রে মিলিত হউক, বৌদ্ধরা জানে কোন্‌টী কি। কাজেই গোলে হরিবোল দিয়া একের সহিত অপরের গোলযোগ ঘটাইলে চলিবে কেন? এই ভাবেই সর্ব্বানন্দ এবং বাংলার অন্যান্য বৌদ্ধ কবি ও লেখকগণের ভাবধারা গ্রহণ করা আবশ্যক।

"জগজ্জ্যোতিঃ" ও "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত" ব্যতীত কবি সর্ব্বানন্দের "ঋষি-সন্দর্শন" নামে অপর একটা অপ্রকাশিত পদ্যরচনার সংবাদ পাই। "সন্দর্শন"-জাতীয় রচনার ধারাও আমরা বাংলার বৌদ্ধ কবি ও লেখকগণের মধ্যে দেখি। "ঋষি-সন্দর্শনে"র পূর্ব্বে নবরাজ-রচিত "মহাবোধিসন্দর্শন" এবং পরে "তরুণ বৌদ্ধ" পত্রিকায় প্রকাশিত অনুজ ৺দীনেন্দ্র-কুমারের "মহামুনি সন্দর্শনে" শীর্ষক সুন্দর কবিতাটি।

পাঁচরিয়ার অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ বিপিন মাষ্টারের (৺বিপিনচন্দ্র বড়ুয়ার) সম্পাদকত্বে এবং পরে নিজ সম্পাদকত্বে "বৌদ্ধ পত্রিকা"র প্রচার ও পরিচালন সর্ব্বানন্দের কৃতিত্বের পরিচায়ক। তখন তিনি ছিলেন চট্টল বৌদ্ধ-সমিতির বিরুদ্ধবাদী মোক্তার সর্ব্বানন্দ। উক্ত পত্রিকার জন্মকাল ১৯০৬ সাল এবং পরমায়ু মাত্র দুই বৎসর। ইহাতেই ধারাবাহিকভাবে তাঁহার "জগজ্জ্যোতিঃ" প্রকাশিত হইতেছিল। "বৌদ্ধ পত্রিকা"র কঠোর মন্তব্য ও টিপ্পনীর ঠেলায় স্থানীয় বৌদ্ধ-সমিতি সতীশ কাকার (সর্ব্বজনপ্রিয় সতীশচন্দ্র বড়ুয়ার) সম্পাদকত্বে সমিতির পূর্ব্ব মুখপত্র "বৌদ্ধবন্ধু"কে পুনর্জ্জীবিত করিতে বাধ্য হইলেন। এ স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক, বাংলার বৌদ্ধগণের নবজাগরণের আদিতে তাঁহাদের অবিসম্বাদিত নেতা সাতবাড়িয়াবাসী কৃষ্ণ নাজির(কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী)ই উহার জনক ও পরিচালক। তখন উহার পর পর বাংলা ও ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হইত। "বৌদ্ধবন্ধু" বহু বার মরিয়া বহু বার বাঁচিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী "বৌদ্ধ পত্রিকা"র সঙ্গে মরিয়া বহুদিন পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত দীর্ঘকালস্থায়ী জগজ্জ্যোতিঃর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পুণ্নানন্দ স্বামীর সম্পাদকত্বে পুনর্জ্জীবিত হইয়া আবার অন্তর্দ্ধান করে বিপক্ষের সঙ্গে সঙ্গে। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাহা আবার শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী ও শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার বড়ুয়ার যুক্ত-সম্পাদকত্বে পুনর্জ্জীবন লাভ করে বঙ্গীয় বৌদ্ধ-সমিতি-পরিচালিত "জাগরণী"র প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে এবং বর্ষকালের মধ্যেই পুনরায় অস্তমিত হয় "জাগরণী"কে মোহনিদ্রাবিভোর করিয়া, এমন কি, অধ্যাপক শ্রীমান্ প্রকৃতিরঞ্জন বড়ুয়ার সুলিখিত 'পাপলোভাতু'র গল্পটি সহ। খ্যাতনামা রাজদূত (রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর)-স্থাপিত বুদ্ধিষ্ট টেক্সট সোসাইটির বহু-তথ্যপূর্ণ জর্ণেল, অনাগারিক ধর্ম্মপাল-স্থাপিত মহাবোধি সোসাইটির মুখপত্র "দি মহাবোধি", আমার ও নেপালবাসী ধর্ম্মাদিত্য ধর্ম্মাচার্য্যের যুক্ত-সম্পাদকত্বে পরিচালিত এবং রেঙ্গুন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত "বুদ্ধিষ্ট ইণ্ডিয়া", শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির-স্থাপিত রেঙ্গুন বুদ্ধিষ্ট মিশনের মুখপত্র "সংঘশক্তি", করলনিবাসী ৺নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও বৈদ্যপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরীর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত "বৌদ্ধবাণী", আবুরখিলবাসী শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়ুয়া-সম্পাদিত "উদয়" এবং শ্রীযুক্ত (অধুনা রায় বাহাদুর) ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও

৺গজেন্দ্রলাল চৌধুরীর যুক্ত-সম্পাদকত্বে পরিচালিত "সম্বোধি" প্রভৃতি সমস্তই কৃষ্ণচন্দ্রের "বৌদ্ধবন্ধুর" পরবর্ত্তী।

"বৌদ্ধ পত্রিকা"য় প্রকাশিত সর্ব্বানন্দের মন্তব্য ও টিপ্পনীতে চট্টল বৌদ্ধগণের চমক ভাঙ্গিয়াছিল, সকলেই যেন ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠার সহিত আপক্ষা করিত—না জানি এবার কাহার পালা। "লালদীঘির পাড়ে ত্রিমূর্ত্তির আবির্ভাব", "বেণী আর কোষে ফটিকচাঁদ কোষাধ্যক্ষ", "কোথায় সে দিনের রসিকতা আর কোথায় এ দিনের রসিকতা", ইত্যাদি হেঁয়ালিপূর্ণ উক্তিগুলির কটাক্ষ কাহার প্রতি ছিল, তাহা স্থানীয় বৌদ্ধ পাঠকসহজে অনুমান করিতে পারিতেন। ইহাতে সর্ব্বানন্দের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অনুসন্ধিৎসা ও সৎসাহসের পরিচয় ছিল।

সর্ব্বানন্দ মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। বৌদ্ধছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা সেকালে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া চট্টগ্রাম কলেজে এল্-এ ক্লাসে পড়েন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কলেজে দুই বৎসর পড়িয়া তিনি নিলেন দারোগাগিরি, তাহা ছাড়িয়া নিলেন মহামুনি মধ্য-ইংরেজী স্কুলের মাষ্টারী এবং শেষে তাহা ছাড়িয়া শহরে করিতে গেলেন মোক্তারী। দারোগা সর্ব্বানন্দ উগ্রপ্রকৃতি ও ক্রোধী, মাষ্টার সর্ব্বানন্দ কঠোর ও কোমল এবং মোক্তার সর্ব্বানন্দ অন্যায়বিরোধী ও স্পষ্টবাদী। নির্ভীকতা এবং সত্যবাদিতাই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি একাধারে ছিলেন রুদ্র ও শিব। তবে দারোগা ও মোক্তার সর্ব্বানন্দ দিয়া কবি সর্ব্বানন্দের অন্তর্জীবনের পরিচয় হয় না। কবি ছিলেন বহু উর্দ্ধে, বুদ্ধের নিতান্ত অনুগত ভক্ত ও সেবক।

তথাপি তাঁহার কবিজীবনের যোগসূত্র ছিল সুদূর অতীতের সঙ্গে। আমরা জাতক গ্রন্থে, ললিতবিস্তর ও বুদ্ধচরিত প্রভৃতি প্রচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে যে সকল বর্ণনা ও ভাববৈচিত্র্য পাই, ঠিক তাহা পাই তাঁহার রচনার মধ্যে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ এত অল্প যে তাহা নাই বলিলেও চলে। অতএব তাঁহার লেখা এবং ভাবধারাও পুরাতনী। বাংলা গদ্যরচনায় তাঁহার প্রতিভা সামান্য। তাঁহার রসিকতার মধ্যে পাই ব্যঙ্গোক্তি ও বিরক্তিকর তীব্রতা; তেমন সরসতা ও নির্বিকারচিত্ততা উহাতে নাই। বুদ্ধাদর্শ তাঁহার মানসচক্ষে সব চেয়ে উজ্জ্বল হইলেও তিনি বৌদ্ধ-চিন্তাকে অপর ভাবধারা হইতে সর্ব্বক্ষেত্রে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারেন নাই। কাজেই প্রগতির ধারায় এ সকল অভাব ও ত্রুটি পূরণের জন্য অপর লেখক, কবি ও সাহিত্যিকের প্রয়োজন ছিল। সেই সন্ধিক্ষণে বাংলার বৌদ্ধ সমাজে উদিত হইলেন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুচ্ছুদ্দী।

বীরেন্দ্র দাদার যুগকে বলা যাইতে পারে বাংলার বৌদ্ধসাহিত্যের এক নবযুগ। তিনি তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে রচনাপটুতার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তখনকার চট্টগ্রাম কলেজ ও কলেজাধীন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল-প্রমুখ শিক্ষকগণের চরিত্রবিচারে। যদিও পূজনীয় শিক্ষকগণের চরিত্রবিচারজনিত অপরাধের জন্য তিনি পরজীবনে লজ্জিত, তথাপি ইহাই

তাঁহার প্রথম কবিতা রচনা বলিয়া তাঁহারই অনুমতিক্রমে বিনীতভাবে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি ১৮৯৬ সালে লিখিয়াছেন :—

"এ কে সেন লার্ণেড ম্যান বাক্যবাণ বিষম,
এস্ কে রায় ফিস্‌ফিসায় ভীরুতায় পরম।
রেবতীর মতি ধীর শান্ত ভদ্র গম্ভীর,
বেণী ব্রাহ্ম মৈত্রী সাম্য স্বাধীনতা লাভার।
বি কে মিত্র কৃষ্ণগাত্র অঙ্কশাস্ত্রে নিপুণ,
উমাকান্ত অতি শান্ত বয়সেও প্রাচীন।
পি লস্কর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে অল্লেতে,
কে কে চক্র কুব্জ বক্র ঘৃণা জাগে ভেট্‌কিতে।
কৃষ্ণদাস বারমাস রোগারোগা চেহারা,
পূর্ণ দত্ত নিয়োজিত সপ্তমেতে পাহারা।
দুর্গাদাস অত্যুচ্ছাশ বিনয়ের আগার,
আমিরালী একা খালি মোস্‌লেম মাষ্টার।"

তাঁহার রচিত 'আমার সংকল্প', 'বাসনা' ও 'জীবন' শীর্ষক চারিটি কবিতা আমি পড়িয়াছি। চারিটিই জগজ্জ্যোতিঃ পত্রিকার ১ম ও ২য় ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি 'জীবন' নামীয় দুইটি চতুর্দ্দশপদী কবিতায়। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনই প্রথম চতুর্দ্দশপদী কবিতার রচয়িতা। বীরেন্দ্র দাদার বিষয়-বস্তু মাইকেল হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার প্রথম কবিতায় আছে বৌদ্ধ সন্ততির সত্যতা, যাহাতে ব্যক্তিগত জীবনধারার অর্থ ও পরিণতি সম্ভব হয়। দ্বিতীয় কবিতায় আছে মানবজীবন ও চরিত্রের বিকাশ পদ্মের উপমায়। এই উপমা ও উদ্দিষ্ট সুন্দর ভাবটি বুদ্ধের উপদেশে সুলভ হইলেও, কবিতায় তাঁহার প্রকাশভঙ্গী ও বর্ণনারীতি নূতন ও হৃদয়গ্রাহী।

জীবন

(১)

দৃষ্টির সীমান্তে হেথা সুনীল গগন
ঢলিয়া পড়েছে নীল আকাশের গায়।
এথা শিলাময় তীরে শিলাময় শৈল
ধরি দেবীমূর্ত্তি বুকে কিবা শোভা পায়।
সে দিগন্ত কোল হ'তে শকতি দুর্জ্জেয়
তরঙ্গের মাঝ দিয়া তরঙ্গ আকারে,
উঠিয়া মিলিয়া পুনঃ মিলিয়া উঠিয়া
আসিছে মিলিছে এই শৈলময় তীরে—

কহিয়ে আমারে,—যেন বুঝি মনোভাব,
"জীবন এমন তব জীবন এমন,
মোহ চক্রবাল হ'তে লভিয়া জনম,
এই তরঙ্গের মত উঠিয়া পড়িয়া
চলিয়াছে অবিরাম, বহু জন্ম পরে
আপনি মিলিয়া যাবে নির্ব্বাণের তীরে।"

(২)

সরোবরে পঙ্কমাঝে লভিয়া জনম
যেমন পঙ্কজ ওই ধীরে ধীরে ধীরে
শিকড়, মৃণাল, পত্র, পাপড়ি, কোরক
একে একে সন্তর্পণে করিয়া সঞ্চয়,
নিরমল বারিরাশি করি অতিক্রম,
উদার আলোক-রাজ্যে, উন্মুক্ত অনিলে
ফুটাইয়া আপনারে বিতরে সুবাস
চারিদিকে, ধরি হৃদে ঊষার শিশির,
তেমনি জীবন অবিদ্যার অন্ধকারে
লভিয়া জনম, সাধু কর্ম্মে সাধু কর্ম্ম
করিয়া যোজনা অপ্রমত্তে, দিনে দিনে,
বিকাশি আপনা জ্ঞানালোকে প্রেমানিলে।
করে দয়া বিতরণ ভুলিয়া আপনা,
নিরন্তর রাখি হৃদে অহিংসা করুণা।

তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে এবং সমসময়ে বাংলার বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকে গদ্য প্রবন্ধ ও বই লিখিয়াছেন, কিন্তু এ জাতীয় রচনা সাহিত্যে স্থান পায় না। উদাহরণ স্থলে, খুল্লমাতামহ কালীকিঙ্কর মুচ্ছুদ্দী গদ্যে বহু সামাজিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা নিস্তরঙ্গ, উহাতে রচনা-বৈশিষ্ট্য নাই। বীরেন্দ্র দাদা "বৌদ্ধবন্ধু" ও "জগজ্জ্যোতিঃ" পত্রিকায় কয়েকটী গদ্য প্রবন্ধ ছাপাইয়াছেন। তাঁহার তিনটী রচনা প্রসিদ্ধ, যথা, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ-সমিতির এক বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, এবং "সুবর্ণ মন্দির" ও "সর্ব্ব ধর্ম্ম অনাত্মা" শীর্ষক প্রবন্ধ। উক্ত অভিভাষণ সম্বন্ধে "ধীরমতি" পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বড়ুয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এই: "ইহার ভাষা আড়ম্বরহীন, স্বচ্ছ, প্রবাহমানা ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট; এ রচনা-প্রণালী সুন্দর, বিশুদ্ধ ও মর্য্যাদাসম্পন্ন; বর্ণনাভঙ্গী নিতান্ত আধুনিক; সর্ব্বোপরি সাজাইবার সুন্দর কৌশল ইহাতে আছে। অতি অল্প-সংখ্যক লোকই এই গুণের অধিকারী।" এই সুচিন্তিত মন্তব্যের অনুকূলে বীরেন্দ্র দাদার "সুবর্ণ

মন্দির" সন্দর্ভের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব। তিনি ইহার উপসংহার অংশে লিখিয়াছেন : "মন তখন লোভহীন, দ্বেষহীন, জ্ঞানময় হইয়া উঠে। বাহ্য ঘটনা তখন আর তাহাকে হেলাইতে পারে না। মন বুঝিয়াছে, সমুদয় অনিত্য, কাহার প্রতি লোভ করিব, সকলেই দুঃখ ভোগ করিতেছে,—আর দ্বেষ করিয়া কাজ নাই। অসত্যে মোহিত হইব না। দুঃখময় সংসারের দুঃখ লাঘব করিব, সকলকেই দয়ার শীতল ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিব। এইরূপে সমস্ত দিনের সমস্ত চিন্তা জুড়াইয়া আর একটা নিত্য সত্য শান্তিরাজ্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া, সাধু-জীবন, প্রেম-জীবন যাপনের নিমিত্ত নবীন বল সঞ্চয় করিয়া আরো ভালবাসিবার জন্য, আরো জীবহিত করিবার জন্য বৌদ্ধ নরনারী স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই পুণ্যমূর্ত্তি স্বর্ণ মন্দিরের পুণ্যময় ছায়াতলে দাঁড়াইয়া, জীবনের এক পুণ্যময় মুহূর্ত্তে এই পুণ্যদৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার প্রাণও গাহিতে পারিয়াছিল :—

উঠ—এস ভাই ; এথা নাহি উঠে ধূলা,
ফুলবাস বহিছে সুন্দর ;
জীবন হইবে তব আনন্দের মেলা
শান্তিময়ী প্রেমের নির্ঝর।"

রেবতী কাকার অভিমত অনুযায়ী আরও দুইটী গদ্যরচনা পাই ঐ সময়ে গগন কাকার দুইটী ছোট লেখাতে। দুইটীই "জগজ্জ্যোতিঃ" পত্রিকার প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়। একটীর নাম "কি লিখিব ছাই ভস্ম"; দ্বিতীয়টী "বুড়দাদার পত্র"। প্রথমটীর শেষভাগে কাকা লিখিয়াছেন : "যে ভাষায় ভাষ্য লিখিয়া বুদ্ধঘোষ অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, যাহা মহাজন-বাক্য বলিয়া অর্চ্চিত হইত, এখন তাহা মৃতভাষা। সেই দেবভাষা আজ উচ্চমূল্যে শ্বেতদ্বীপ হইতে ক্রীত হইয়া থাকে। তাই বলি, আজ ভারত অন্তরতলে সেই ভস্মরাশি রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাহার গৌরব পৃথিবীব্যাপ্ত। সেই ভস্মরাশির কিয়দংশ চিরমলয়ানিলসঞ্জাত সিংহল-দ্বীপে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাও একটী পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া আছে। রজতশুভ্র রাজনিকেতন হইতে এই ভস্মরাশি বক্ষে করিয়া রাজপুত্র মহেন্দ্র ও রাজকন্যা সংঘমিত্রা ঊর্মিমালা অতিক্রম করিয়া এই রম্যদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া এখনও মহাবংস উজ্জ্বল অক্ষরে গৌরব কীর্ত্তন করিতেছে। তাই কবি গাহিয়াছেন—

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ ভাই,
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

বীরেন্দ্র দাদার গদ্যপদ্য সকল রচনাই বৌদ্ধ কিংবা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে। যদিও ইংরেজী এবং বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল, তিনি বৌদ্ধগণ্ডী ছাড়াইয়া বিশেষ কিছুই লিখিতে যান নাই। এই সংকীর্ণ গণ্ডী পরিহারের পথে কালীকিঙ্কর মুচ্ছদ্দী-লিখিত "চট্টল উল্লাস" এবং মতিলাল দাদার কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ণানন্দ সামী মতিলাল দাদার পরিচয়প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার কবিত্বশক্তি-উন্মেষের মূলে ছিল একদিকে পিতৃ-গুণ এবং অপর দিকে বীরেন্দ্র দাদার ছোট ভাই রাজেন্দ্রলাল মুচ্ছদ্দীর সহিত প্রতিযোগিতা।

আমরা পূর্ব্বে তাঁহার ক্ষুদ্র দৃশ্যকাব্য "শীলরক্ষিতে"র বিষয় আলোচনা করিয়াছি, যাহার উপাখ্যান-অংশ তিনি শীলকবাসী কবিরাজ ৺নগেন্দ্রলাল বড়ুয়ার "বৌদ্ধ কাহিনীসংগ্রহ" হইতে পাইয়াছিলেন। ইহার একটী উক্তি হৃদয়স্পর্শী :—

"যেমন সবার প্রাণ উহারো তেমন।
যেই প্রাণ দিতে নারি, কেমনে কাড়িয়ে
স্বেচ্ছায় লইব তাহা, বলুন রাজন্!"

তাঁহার রচিত কবিতাগুলি সমস্তই "নবীন সেনী"। "অবকাশরঞ্জিনী"র নামের সঙ্গে মিলাইয়াই তিনি তাঁহার কবিতাসংগ্রহের নামকরণ করিয়াছিলেন "অবসরতোষিনী"। ইহার মাত্র একটী কবিতা আমাব ভাল লাগিয়াছে,—'উদ্যান ভ্রমণ, প্রথম দিবস ও দ্বিতীয় দিবস'। কবি-কল্পনার সাথে প্রকৃতির সকল বস্তু ও জীব নিরীক্ষণ করিয়া সকলের মধ্যে সৌন্দর্য ও শিক্ষণীয় বিষয় দেখিয়াছিলেন। পরে তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়া "ব্রহ্মসুন্দরী" নামে এক কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। ইহার প্রারম্ভে তিনি বাগেদবীর আরাধনা করিলেন, যাহাতে ব্রহ্মদেশের নরনারীর ব্যভিচার ও কুৎসিত জীবন বর্ণনা করিয়া ঐ বিষয়ে দেশবাসীকে সাবধান করিতে পারেন। ইহাতে বাণী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন নাই এবং তাঁহার প্রথম সর্গ শেষ না হইতেই তাঁহার কাব্যরচনা বন্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মজাতির সব কিছুতে কুৎসিতদর্শী "ব্রহ্মসুন্দরী"র ১ম সর্গের রচয়িতা 'উদ্যান ভ্রমণে' প্রকৃতির সর্ব্বত্র সৌন্দর্যদর্শী কবির প্রেতমূর্ত্তি মাত্র।

তাঁহার পরে বাংলার বৌদ্ধসমাজে দুই একজন সামান্য সামান্য কবি দেখা দিলেন, যাঁহাদের প্রতিভার বিকাশ হইতে পারিল না পরমায়ুর অভাবে। আমরা তাঁহাদের রচনায় বৌদ্ধ এবং অপর বিষয়ের প্রতি সম অনুরাগ দেখি। আমার জানিত দুই জন বৌদ্ধকবি এই নূতন পথের পথিক, প্রথম, আবদুল্লাপুরবাসী হরিশ্চন্দ্র বড়ুয়া, যাঁহার রচিত কতকগুলি কবিতা "বৌদ্ধবন্ধু"তে প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয়, সাতবাড়িয়াবাসী সহপাঠী বিমলবিনোদ বড়ুয়া, যাঁহার 'উচ্ছ্বাস', 'ভিক্ষুগণের প্রতি', 'জীবন-সংগীত', 'বর্ষকথা', 'বুদ্ধত্ব', 'আশা' ইত্যাদি নানা বিষয়ে রচিত ছোট বড় কবিতাগুলি "জগজ্জ্যোতি:" পত্রিকার প্রথম বর্ষ হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্য থাকিলেও, বিমলবিনোদের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য যে, তাঁহার বৌদ্ধ-বিষয়ক 'বুদ্ধত্ব' কবিতাটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট :—

"শান্ত-স্নিগ্ধ-তরুছায়ে দাঁড়ায় আপনহারা—
গভীর ভাবনাবশে আধেক নয়ন মুদি'
চিন্তিল যুবক যোগী—কেন ব্যাধি, মৃত্যু, জরা,
এ অনন্ত জগতের কোথা অন্ত কোথা আদি?"

মহিম দাদার (শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন বড়ুয়া), রেবতী কাকার, আমার এবং অপূর্ব্বরঞ্জনের বি-এ ও এম-এ পাশের দিন হইতে বাংলার বৌদ্ধ সমাজে ও সাহিত্যে পাশ্চাত্য যুগের সৃষ্টি হয়, যাহার বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল অধ্যায়ে শিক্ষিত বৌদ্ধদের অনেকেই বহির্মুখী। পূর্ব্ব ও পরের

মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছে পূর্ব্ব প্রিয় ছাত্র ও আত্মীয় শীলকনিবাসী কবি ও লেখক শ্রীমান্ মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া, এম্-এ। "সিদ্ধার্থের সাধনা", "করুণা", "মিনুটির স্বপ্ন" (তরুণ বৌদ্ধ), "জুমিয়া সঙ্গীত", "রবিকল্যাণ—রবীন্দ্রনাথের প্রতি", "ধর্ম্মপদ হইতে অনুবাদ" (দেশ), "নারীর আবরণ", "অঙ্গুলিমাল", "অর্দ্ধকাশী", "অনোমা", "ভিক্ষু", "লীলাময়ী", "রবীন্দ্র মহাপ্রয়াণে", "বুদ্ধের জীবনের কয়েকটী ঘটনা", "কালি ও কলম" (সংঘ-শক্তি) পথ"ও "শেষ দীক্ষা" (বঙ্গশ্রী) তাহার রচিত কবিতাবলী। "অকৃতজ্ঞ" (তরুণ বৌদ্ধ) "মহাস্থবির কালীকুমার" ও "বৌদ্ধগার্হস্থ্য ধর্ম্মের আদর্শ" (সংঘ-শক্তি), "নাট্যাচার্য অমৃত-লাল" (শ্যামবাজার এ-ভি-স্কুল ম্যাগাজিন) এবং "বুদ্ধবর্ণিত স্বাধীন জাতির আদর্শ" (দেশ) তাহার গদ্য রচনাবলী। বীরেন্দ্র দাদা ও গগন কাকার গদ্যের সন্ততিস্বরূপে তাহার "অমৃতলাল" প্রবন্ধ পাই ;—

"মানুষের স্বভাবধর্ম্মে অনুভূতিই প্রধান। যাহার অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার হৃদয়ে ঔদার্য ও প্রসারতা মোটেই স্থান পায় না। অনুভূতি না থাকিলে মানুষ অপরের হৃদয় জয় করিতে পারে না। সেই জন্য যাহারা নির্ম্মল, কঠোর, সহানুভূতি বা সমবেদনা যাহাদের চিত্ত স্পর্শ করে না, তাহারা বাস্তবিকই এ পৃথিবীতে বড়ই একা ও দীন।"

আবুরখিলবাসী শ্রীমান্ শশাঙ্কবিমল বড়ুয়া স্বগ্রামের পথ-প্রদর্শকত্রয়কে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন : "হে চিরজীবিত, চির অমর দার্শনিক ডাক্তার রামচন্দ্র, পণ্ডিত ধর্ম্মরাজ ও কবিবর সর্ব্বানন্দ! তোমরা আমাদের লহ লহ প্রণাম, লহ অভিবাদন, লহ হৃদয়ের অর্ঘ্য, অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রাণের কুসুম ও নয়নাশ্রুর অঞ্জলি।......লঙ্কা-বিজয়ী রাবণজয়ী রামচন্দ্র অপেক্ষা জীবন-যুদ্ধে বিজয়ী তৃষ্ণাজয়ী রামচন্দ্র হীন কিসে? সংগ্রামে সহস্র সহস্র সৈন্যকে জয় করার চেয়ে নিজকে নিজে জয় করা শ্রেয় নহে কি? সত্যব্রতী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপেক্ষা প্রাণী ইত্যাদি পাপবিরত সর্ব্ববিষয়ে সংযত সত্যব্রতী ধর্ম্মরাজের স্থান নীচে হইবে কেন? সদানন্দ সর্ব্বানন্দ অপেক্ষা দিব্যলোকবিহারী দিব্যানন্দপ্রচারী কবি সর্ব্বানন্দও বা কম কিসে?"

নবযুগের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সমাজে সাহিত্যরচনার প্রচেষ্টাগুলিকে প্রধানতঃ ছয়টী ধারায় বিভক্ত করা চলে, যথা, (১) গদ্য ও পদ্য অনুবাদ, (২) অপর গ্রন্থের সংক্ষেপ কিম্বা বিস্তার, (৩) সংগ্রহ, (৪) বিবিধ ব্যাখ্যা ও সন্দর্ভ, (৫) প্রতিবাদ ও সমালোচনা এবং (৬) মৌলিক রচনা। মাতুল শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুৎসুদ্দির "জাপানী বৌদ্ধসম্প্রদায়", শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবিরের "মিলিন্দ প্রশ্ন" ও "স্থবির গাথা", ৺জ্যোতিপাল ভিক্ষুর "উদান", শ্রীমৎ মুণীন্দ্রপ্রিয় (প্রজ্ঞানন্দ) ভিক্ষুর "মহাবর্গ", শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবিরের "কচ্চায়ন", "বালাবতার" ও "প্রাতিমোক্ষ", শ্রীমৎ আর্যবংশ ভিক্ষুর "সুবোধালঙ্কার" এবং শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের "ভক্তি শতক" প্রথম ধারার অন্তর্গত। শ্রীমৎ ধর্ম্মতিলক ভিক্ষুর "সারসংগ্রহ" ও "কায়বিজ্ঞান" এবং শ্রীমৎ প্রজ্ঞা-লোকস্থবির-কৃত "গৃহিকর্ত্তব্য", "ভিক্ষুকর্ত্তব্য", "দানমঞ্জরী" ও "ধর্ম্ম সংহিতা" প্রভৃতি দ্বিতীয় ধারার অন্তর্গত। ৺কবিধ্বজ গুণালঙ্কারের "ধর্ম্মপ্রসঙ্গ", ৺কালীকুমার মহাস্থবিরের

"চন্দ্রকুমার জাতক", কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারকবন্ধু বড়ুয়ার "নাগলীলা" এবং শ্রীমান্ বিমলানন্দ ভিক্ষুর "বেশ্বন্তর" প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর "বুদ্ধের অভিযান", শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবিরের "প্রজ্ঞাভাবনা", শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বড়ুয়ার "শান্তিপদ" ও "প্রজ্ঞাদর্শন", রাউজাননিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বড়ুয়ার "নামরূপ", ৺ধনঞ্জয় বড়ুয়ার "কর্ম্মফল" এবং শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের "পালি প্রবেশ" প্রভৃতি চতুর্থ ধারার সহিত যুক্ত। "নারায়ণ" পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-লিখিত "বৌদ্ধধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ (বড়মামা ৺দক্ষিণারঞ্জন মুৎসুদ্দি-লিখিত) এবং "শনিবারের চিঠি"তে রায় বাহাদুর ৺দীনেশচন্দ্র সেনের "শ্যামল ও কজ্জল" গল্প বইয়ের সমালোচনা পঞ্চম ধারার অন্তর্গত। বাগ্মী ৺সুরেন্দ্রলাল মুচ্ছদ্দী-রচিত বৌদ্ধ-নাটিকা, শ্রীমান্ (অধুনা অধ্যাপক) সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া-রচিত "পরশমণি" নামক ছোট নাটক, মোক্তার শ্রীযুক্ত কিরণবিকাশ মুৎসুদ্দি-প্রণীত "বেস্সন্তর" নাটক ও কবিতা, পণ্ডিত ৺অনন্তকুমার বড়ুয়া-রচিত "সম্বোধি" শীর্ষক কবিতাটি, শ্রীযুক্ত বসুভূতি মুৎসুদ্দী, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বড়ুয়া বি-এল, ৺নিবারণচন্দ্র বড়ুয়া বি-এ এবং মেসো মহাশয় শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী চৌধুরী-রচিত বিবিধ কবিতা, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দির "মাতৃপূজা ও মানবধর্ম্ম", পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের "অন্ধের দৃষ্টি" এবং জ্যোতির্ম্মালার (শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী রায় চৌধুরীর) "সন্ধানে", "বিলাত দেশটা মাটীর" ও 'শকুন্তলার স্বপ্ন' এই তিনটি উপন্যাস পঞ্চম ধারার অন্তর্গত। বিদ্যাবিনোদের "অন্ধের দৃষ্টি" বস্তুতঃ তাঁহার আত্মজীবনী, ইহাতে ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য অতি অল্প। জ্যোতির্ম্মালার কবিতাগুলির কল্পনা ও বর্ণনাভঙ্গী যেমন সুন্দর, ভাবগুলি তেমনই অস্পষ্ট।

যদি বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ-অবদান প্রগতির ধারা বর্ণনা করিতে গিয়া প্রত্যেক গুণীর গুণের সঙ্গে সঙ্গে দোষও প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহার কৈফিয়ৎ জীবনারম্ভেই ত সাদির "দি স্কলার" কবিতার "অধ্যয়ন" শীর্ষক অনুবাদে দিয়া রাখিয়াছি :—

"অতীতের সহবাসে যাপি এ জীবন
যখন যে দিকে চাই
কেবল দেখিতে পাই
প্রাচীনের গতপ্রাণ সাধু মহাজন।"
"তাঁহাদের লয়ে মম কল্পনা চিন্তন
বহুকালগত ভবে করি বিচরণ ;
তাঁহাদের গুণে ভক্তি,
কেবল দোষেরে ত্যজি,
আশা ভয় সকলই তাঁদের মতন।"

আমার এই সামান্য বিবৃতিতে হয় ত বহু কৃতী কবি, ধার্মিক, সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করি নাই। সে অপরাধ আমার অনিচ্ছাকৃত। এ ক্ষেত্রে আমার কৈফিয়ৎ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্ত্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তার এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয়—উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।"

বাংলার মুষ্টিমেয়, দুঃখদৈন্যগ্রস্ত ও অসহায় বৌদ্ধগণ গত একশত বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। তাঁহাদের পশ্চাতে এক দীর্ঘ আর্যসংস্কৃতির অবদান না থাকিলে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। যদি তাঁহাদের মধ্যে খুব বড় কবি, লেখক, সাহিত্যিক কিম্বা দার্শনিক না জন্মাইয়া থাকেন, তাহাতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই, কারণ, সারা বাংলায়, ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতেও বা এই সকল গুণীব্যক্তি সংখ্যায় কয়জন! "আমরা এ ভাবে যাত্রা করিয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছি, কিন্তু আমাদের চলার পথ শেষ হয় নাই। এবং কখনও শেষ হইবে না, আমরা চলিতেই থাকিব ধীর মন্থর গতিতে, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও চিন্তার নব নব আদর্শরূপ রচনা করিতে করিতে"—এই ভাবটী সতত স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইলেই বাংলার বৌদ্ধগণের তথা আর সকলের প্রগতির ধারা অব্যাহত থাকিবে।*

* ১৩৪৬।৫ই মার্চ্চ আবুরখিল গ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চট্টগ্রাম-শাখা কর্ত্তৃক আহূত বিশেষ অধিবেশনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ।

রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

অমৃতলাল বসু

জন্ম : ১৭ এপ্রিল ১৮৫৩ মৃত্যু : ২ জুলাই ১৯২৯

১। **হীরকচূর্ণ নাটক**। ১২৮২ সাল (১ জুন ১৮৭৫)। পৃ. ৬৮।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম "By an Actor" ছিল।

২। **চোরের উপর বাটপাড়ি** (প্রহসন)। ১২৮৩ সাল (১১ নবেম্বর ১৮৭৬)। পৃ. ৩৪।...গ্রেট ন্যাশনাল ১৮৭৫।

৩। **তিলতর্পণ**। (৪ জানুয়ারি ১৮৮১)। পৃ. ৪৩

৪। **ব্রজলীলা** (নাট্যরাসক)। ১২৮৯ সাল (৩০ নবেম্বর ১৮৮২)। পৃ. ২৩।

৫। **ডিস্‌মিশ** (প্রহসন)। ১২৮৯ সাল (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩)। পৃ. ৩১।...বেঙ্গল ১২৮৯।

৬। **চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে**। ইং ১৮৮৪ (?)...ষ্টার ১৬ এপ্রিল ১৮৮৪।

১৩০৪ সালে 'ব্রজলীলা' ও 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' একত্রে প্রকাশিত হয়।

৭। **বিবাহ বিভ্রাট**। ১২৯১ সাল (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৪)। পৃ. ৬৯।...ষ্টার ১২৯১।

৮। **নিমাইচাঁদ** (গল্প)। (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)। পৃ. ২৪।

৯। **তাজ্জব ব্যাপার** (গীতিরঙ্গ)। ১২৯৭ সাল (২ আগষ্ট ১৮৯০)। পৃ. ৩০।

১০। **তরুবালা** (সামাজিক নাটক)। ১২৯৭ সাল (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১)। পৃ. ১৪৭। ...ষ্টার।

১১। **বিলাপ** ! বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন। ১২৯৮ সাল (২২ আগষ্ট ১৮৯১)। পৃ. ২৬।...ষ্টার ৬ ভাদ্র ১২৯৮।

১২। **রাজা বাহাদুর** (সং—রং)। ১২৯৮ সাল (ইং ১৮৯২)। পৃ. ৪৮।...ষ্টার বড়দিন ১৮৯১।

১৩। **কালাপানি** বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা। ১২৯৯ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ৫১।...ষ্টার ১১ পৌষ ১২৯৯।

১৪। **বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত** (পারিবারিক নাটক)। ১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ১৫১।...ষ্টার ১১ ভাদ্র ১৩০০।

১৫। **বাবু** (সামাজিক নক্সা)। ১৩০০ সাল (২৭ জানুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ৯১।...ষ্টার ১৮ পৌষ ১৩০০।

১৬। **একাকার**। ১৩০১ সাল (১৯ জানুয়ারি ১৮৯৫)। পৃ. ৯৫।...ষ্টার ১১ পৌষ ১৩০১।

১৭। **বৌ-মা** (সামাজিক নক্সা)। ২৫ পৌষ ১৩০৩ (১১ জানুয়ারি ১৮৯৭)। পৃ. ১০০।
…ষ্টার ১১ পৌষ ১৩০৩।

১৮। **অবলা বল** (উপন্যাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭)। পৃ. ১২৫

১৯। **চঞ্চলা** (উপন্যাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭)। পৃ. ১৬২।

২০। **গ্রাম্য-বিভ্রাট** (সামাজিক নক্সা)। মাঘ ১৩০৪ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮)। পৃ. ১১৬।…ষ্টার ১৮ পৌষ ১৩০৪।

২১। **হরিশ্চন্দ্র** (পৌরাণিক নাটক)। ১৩০৬ সাল (ইং ১৮৯৯)।

২২। **সাবাস আটাশ** (নক্সা)। আশ্বিন ১৩০৬ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০০)। পৃ. ৬৫।
· ষ্টার ৭ আশ্বিন ১৩০৬।

২৩। **কৃপণের ধন** (প্রমোদ-প্রহসন)। ১৩০৭ সাল (৯ জুন ১৯০০)। পৃ. ৮০।…ষ্টার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭।

২৪। **আদর্শ-বন্ধু** (নাটক)। বৈশাখ ১৩০৭ (৫ আগষ্ট ১৯০০)। পৃ. ২১৪।…ষ্টার ১৬ বৈশাখ ১৩০৭।

২৫। **যাদুকরী** (পঞ্চরং)। ১৫ পৌষ ১৩০৭ (৩০ জানুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ৭৮।…ষ্টার ১০ পৌষ ১৩০৭।

২৬। **বৈজয়ন্ত-বাস**। মাঘ ১৩০৭ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ১৭।…ষ্টার।
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গ-গমন উপলক্ষে লিখিত।

২৭। **নবজীবন** (মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একাঙ্ক নাট্যলীলা)। ১৩০৮ সাল (২৫ মার্চ ১৯০২)। পৃ. ৩৫।…ষ্টার ১ জানুয়ারি ১৯০২।

২৮। **অবতার** (প্র-পরা-অপ-সং-হসন্)। মাঘ ১৩০৮ (২ এপ্রিল ১৯০১)। পৃ. ৯০+১।
…ষ্টার ২৫ ডিসেম্বর ১৯০১।

২৯। **অমৃত-মদিরা** (কবিতা)। কার্ত্তিক ৩১০ (২০ অক্টোবর ১৯০৩)। পৃ. ২৯০।

৩০। **সাবাস বাঙ্গালী** (সামাজিক নক্সা)। ১৩১২ সাল (২৮ জানুয়ারি ১৯০৬)।
পৃ. ৬২।…ষ্টার ১০ পৌষ ১৩১২।

৩১। **খাস-দখল** (নাট্যলীলা)। ? (২৮ এপ্রিল ১৯১২)। পৃ. ১৪৩।…ষ্টার ১৭ চৈত্র ১৩১৮।

৩২। **নব-যৌবন** (নাটিকা)। ? (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪)। পৃ. ২১১।…মিনার্ভা ২০ ডিসেম্বর ১৯১১।

৩৩। **বিষবৃক্ষ** (নাট্য-রূপ)। ? (২৩ মার্চ ১৯২৫)। পৃ. ১৯১।

৩৪। **চন্দ্রশেখর** (নাট্য-রূপ)। ? (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫)। পৃ. ১৭২।

৩৫। **রাজসিংহ** (নাট্য রূপ)। ? (১৮ মে ১৯২৬)। পৃ. ১৮৮।

৩৬। **কৌতুক-যৌতুক** (নক্সা ও গল্প)। ১৩৩৩ সাল (১২ জুন ১৯২৬)। পৃ. ২৫৬।

সূচী :— আমের ধুমধাম, পতিত ডাক্তার, কৌলিক দুর্গোৎসব, শারদা-মঙ্গল, ঘোদ্-দা, বিষ্যা "অমূল্য ধন", বৃন্দার আনন্দ, মাতৃভক্তি, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, বিশ্বকর্ম্মা পূজা, কবির ভাব এসেছে, হিন্দুর নব নামকরণ, ষষ্ঠীর প্রভাত, প্রতাপের গল্প, উমাকান্তের গল্প, গো-গোল-যোগ, ইলিশ, নলের নব কলেবর, বিষম সমস্যা, আগমনী, থিয়েটারের পিয়ু, প্রেমের আবেগ।

৩৭। **ব্যাপিকা-বিদায়** (প্রমোদ-প্রহসন)। ? (ইং ১৯২৬)। পৃ. ৮২।···মিনার্ভা ২৫ আষাঢ় ১৩৩৩।

৩৮। **বন্দে মাতনম্** (হাস্যোৎসব)। কার্ত্তিক ১৩৩৩ (১৭ নবেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ৫০।··· ষ্টার ২৪ কার্ত্তিক ১৩৩৩।

৩৯। **যাজ্ঞসেনী** (নাটক)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮)। পৃ. ১৭৬।···মিনার্ভা ২২ বৈশাখ ১৩৩৫।

পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়। আশ্বিন ১৩৩০ (ইং ১৯২৩)।

বিপিনবিহারী গুপ্ত এই পুস্তকের ৬৩-১৩৬ পৃষ্ঠায় ১৩২২-২৩ সালে অমৃতলাল কর্ত্তৃক বিবৃত স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অমৃত-গ্রন্থাবলী, ১—৪ ভাগ। ইং ১৯০৬-৭, ১৯১১।

অমৃতলালের জীবিতকালে বসুমতী কার্য্যালয় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। গ্রন্থাবলীর ২য় ভাগে মুদ্রিত নাট্যরাসক 'সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক-ভঞ্জন' প্রকৃতপক্ষে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা ('শনিবারের চিঠি', আশ্বিন ১৩৫২ দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থাবলীর চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত 'সম্মতি-সঙ্কট', বিরাট বৃহস্পতি, বাহবা বাতিক ও আরও কয়েকটি রচনা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই; এগুলি কোন-না-কোন সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। সম্মতি-সঙ্কট দুর্গাদাস দে-সম্পাদিত 'মজ্‌লিস' পত্রের ১ম বর্ষে (মাঘ ও ফাল্গুন ১২৯৭) প্রকাশিত হয়।

সম্পাদিত : 'বীণার ঝঙ্কার', সচিত্র (নির্ব্বাচিত গীত, রঙ্গরস প্রভৃতি)। ১৩১৯ শ্রীপঞ্চমী।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

অমৃতলালের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধাদি বহু রচনা 'বিভা' (১২৯৪), 'অনুসন্ধান' (১৩০১), 'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ' (১৩০১), 'ভারতী' (১৩১২, ১৩৩০, ১৩৩২), 'নাট্য-মন্দির' (১৩১৭, ১৩১৯-২০), 'বঙ্গবাণী' (১৩২৯,১৩৩১-৩২), 'সচিত্র শিশির' (১৩৩১-৩৩) 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' (১৩২৩), 'মাসিক বসুমতী' (১৩২৯-৩৬), 'বার্ষিক বসুমতী' (১৩৩২-৩৪) প্রভৃতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; ইহার অনেকগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম : ১ এপ্রিল ১৮৭৬ মৃত্যু : ৬ জানুয়ারি ১৯১৬

১। **উষা** (গীতি-নাট্য)। ? (১ মার্চ ১৮৯৩)। পৃ. ৬৯।
কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে। 'উষা' 'অমর-গ্রন্থাবলী'তে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

২। **মানকুঞ্জ** (গীতিনাট্য)। ১৩০০ সাল (১১ এপ্রিল ১৮৯৪)। পৃ. ২৭
অমরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের নিকট ইহার এক খণ্ড দেখিয়াছি। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এই গীতি-নাট্যখানি 'শ্রীরাধা' নামে প্রকাশিত হয়।

৩। **কাজের খতম** (বড়দিনের পঞ্চরং)। ইং ১৮৯৮ (১৫ ডিসেম্বর)। পৃ. ৫০।
…ক্লাসিক ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৭।

৪। **নির্ম্মলা** (গীতিকাব্য)। চৈত্র ১৩০৫ (ইং ১৮৯৯)। পৃ. ১৩৮।
…ক্লাসিক ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৮।

৫। **শ্রীকৃষ্ণ** (গীতিনাট্য)। ভাদ্র ১৩০৬ (ইং ১৮৯৯)। পৃ. ৪৬।
…ক্লাসিক থিয়েটার ২৬ আগষ্ট ১৮৯৯।
সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতি পুস্তকালয়ে ইহার এক খণ্ড আছে।

৬। **মজা** (সামাজিক নক্সা)। ১৩০৬ সাল (৩ মার্চ ১৯০০)। পৃ. ৭৪।
…ক্লাসিক ১ জানুয়ারি ১৯০০।

৭। **ফটিক জল** (নাটিকা)। ইং ১৯০২ (?)।…ক্লাসিক ১২ এপ্রিল ১৯০২।

৮। **শ্রীরাধা** (গীতি-নাট্য)। ১৩১১ সাল (২ জুন ১৯০৪)। পৃ. ২৭।…ক্লাসিক ১০ জুলাই ১৯০৪।
ইহা 'মানকুঞ্জ' গীতিনাট্যের নামান্তর।

৯। **শিবরাত্রি** (পৌরাণিক গীতি-নাটিকা)। ১৩১১ সাল (১০ মার্চ ১৯০৫)। পৃ. ২৪।
…ক্লাসিক ৪ মার্চ ১৯০৫।

১০। **ঘুঘু** (নক্সা)। ? (২০ মে ১৯০৫)। পৃ. ৩৪।…গ্রাণ্ড থিয়েটার ২০ মে ১৯০৫।

১১। **বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ** বা Partition of Bengal (নাট্যরূপক)। ? (১২ আগষ্ট ১৯০৫)। পৃ. ৭।…গ্রাণ্ড থিয়েটার ৯ আগষ্ট ১৯০৫।*

১২। **প্রণয় না বিষ ?** (নাটক)। ইং ১৯০৫ (?)। পৃ. ৬৩।…ক্লাসিক থিয়েটার ২৩ ডিসেম্বর ১৯০৫।

---

* এই পুস্তিকার মলাট বা আখ্যাপত্রে প্রকাশ :—"২৪শে শ্রাবণ ১৩১২ বুধবার গ্রাণ্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।" 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' পুস্তকে (পৃ. ৫৪৬) এই রূপকের প্রথম অভিনয়কাল ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ বলা হইয়াছে, ইহা ঠিক নহে। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এই পুস্তিকার এক খণ্ড আছে।

ইহার আখ্যানভাগ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রণয়-পরিণাম' উপন্যাস হইতে গৃহীত। আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড 'প্রণয় না বিষ?' শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থ-সংগ্রহে দেখিয়াছি। নাটকখানি অমর-গ্রন্থাবলীতে স্থান লাভ করে নাই।

১৩। **এস যুবরাজ** (রূপক)। ইং ১৯০৫ (?)।...ক্লাসিক ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৫।

১৪। **দলিতা-ফণিনী** (নাটিকা)। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ (৭ মে ১৯০৮)। পৃ. ১২৩।... মিনার্ভা ৩০ নবেম্বর ১৯০৭।

১৫। **কেয়া মজেদার** (প্রমোদ রঙ্গনাট্য)। পৌষ ১৩১৫ (৮ জানুয়ারি ১৯০৯)। পৃ. ৫৩।...ষ্টার ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৮।

১৬। **আশা-কুহকিনী** (ঐতিহাসিক নাটিকা)। পৌষ ১৩১৬ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯১০)। পৃ. ৭২।...ষ্টার ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৯।

১৭। **জীবনে-মরণে** (নাটিকা)। ১৩১৮ সাল (২৪ নবেম্বর ১৯১১)। পৃ. ১০৮।... গ্রেট ন্যাশনাল ১৭ জুন ১৯১১।

রবীন্দ্রনাথের "দালিয়া" গল্প অবলম্বনে রচিত।

১৮। **অভিনেতৃ-কাহিনী** (জীবনী)। ১৩২১ সাল (২০ জুন ১৯১৪)। পৃ. ১২৮।

এই সচিত্র জীবনী অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে গিরিশচন্দ্র, মনোমোহন বসু, মহেন্দ্রলাল বসু, সুকুমারী দত্ত, তারাসুন্দরী, ধর্মদাস শূর, তিনকড়ি, সুশীলাবালা, দানি বাবু প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আছে।

১৯। **অভিনেত্রীর রূপ** (উপন্যাস)। ? (২২ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। পৃ. ২৫৪

২০। **প্রেমের জেপ্‌লিন** (রঙ্গনাট্য)। ? (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫)। পৃ. ৪৫।... ষ্টার ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

২১। **কিস্‌মিস্‌** (রঙ্গনাট্য)। ১৩২৫ সাল (ইং ১৯১৮)। পৃ. ৪৮।...ষ্টার ৩ মে ১৯১৩।

২২। **আদর** (উপন্যাস)। অগ্রহায়ণ ১৩২৭ (ইং ১৯২০)। পৃ. ৯৫।

ইহা প্রথমে "সমাজচিত্র" নামে 'সৌরভ' পত্রে (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩০২) এবং পরে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'অমর-গ্রন্থাবলী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

২৩। **ভ্রমর** (নাটক)। ? (ইং ১৯৩৯ ?)। পৃ. ১৪৯।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র নাট্য-রূপ।

২৪। **ইন্দিরা** ও **কমলাকান্ত** (নাট্যাকারে গ্রথিত)। ? (১ জুন ১৯৪০)। পৃ. ১৫৯

অমর-গ্রন্থাবলী :— ১৩০৯ সালে (১০ মে ১৯০২) প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে অমরেন্দ্রনাথের 'ছুটী প্রাণ' (গীতিনাট্য), 'থিয়েটার' (প্রহসন), 'চাবুক' (প্রহসন), ও 'দোল-লীলার গীতাবলী' প্রথম মুদ্রিত হয় ; এগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

১৩১৩ সালে (জুলাই-আগষ্ট ১৯০৬) বসুমতী কর্তৃক দুই খণ্ডে প্রকাশিত অমর-

গ্রন্থাবলীতে 'আদর' (উপন্যাস) ও 'হরিরাজ' (ঐতিহাসিক নাটক) অতিরিক্ত স্থান পাইয়াছে। 'হরিরাজ' নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর রচনা, ১৩০২ সালে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়; ইহাকে অমরেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় একাধিক-বার-প্রকাশিত 'অমর-গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত হয় নাই।

বসুমতী-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পরবর্ত্তী একটি সংস্করণে অমরেন্দ্রনাথের 'রোকশোধ' ও 'বড় ভালবাসি' সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়াছে।

সাময়িক-পত্র সম্পাদন

শৈশব হইতেই অমরেন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতেন। ১৩০১ সালের মাঘ ও ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'জন্মভূমি' পত্রে তাঁহার রচিত দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হীরেন্দ্রনাথেরও অনেক কবিতা জন্মভূমিতে স্থান পাইয়াছিল।

'সৌরভ'।—রচনাদি প্রকাশের সুবিধার জন্য অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে সম্পাদক করিয়া এবং নিজে সহকারী সম্পাদক হইয়া ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাস হইতে 'সৌরভ' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, তিন সংখ্যা বাহির হইয়াই বন্ধ হইয়া যায়। 'সৌরভে' গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি রচনা ছাড়া, অমরেন্দ্রনাথের অনেক রচনা—প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, নকশা প্রভৃতি—স্থান পাইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে আমরা এই তিন সংখ্যা 'সৌরভ' দেখিয়াছি।

'নাট্য-মন্দির'।—১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাস হইতে অমরেন্দ্রনাথ 'নাট্য-মন্দির' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। চতুর্থ বর্ষের (১৩২০ সাল) অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্য্যন্ত তিনি এই পত্রের সহিত যুক্ত ছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে দুইখানি সাপ্তাহিক নাট্য-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমখানি 'রঙ্গালয়', ১ম সংখ্যার তারিখ—১ মার্চ ১৯০১; দ্বিতীয়খানি 'থিয়েটার', প্রথম সংখ্যার তারিখ—১০ জুলাই ১৯১৪। এই উভয় পত্রেই অমরেন্দ্রনাথের কোন কোন রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

রেখ-মন্দিরের বিবর্ত্তন

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ওড়িষায় পুরী অথবা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গড়ন যে ধরণের, শিল্পশাস্ত্রের ভাষায় তাহাকে রেখ-দেউল বলে। ফার্গুসন ইহাকে 'ইণ্ডো-এরিয়ান' জাতীয় মন্দির বলিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ ইহাকে শিখর, নাগর বা কলিঙ্গ নামেও অভিহিত করিয়াছেন। যাঁহারা রেখ-মন্দিরের আকৃতিগত বিবর্ত্তন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অনুসন্ধানের জন্য তাঁহারা প্রধানত একটি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনী লিখিবার সময়ে যেমন তাঁহার জন্মের সন-তারিখ লইয়া আরম্ভ করিতে হয়, এবং বংশ-পরিচয় দিতে হয়, রেখ মন্দিরের ইতিহাসের সম্পর্কেও তেমনই অনেকে প্রথমে ইহার উদ্‌ভব কোথায় হইয়াছিল এবং কি করিয়া ইহার বর্ত্তমান আকৃতি দাঁড়াইল, প্রথমে সেই সমস্যার সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অগণিত রেখ-দেউলের মধ্যে কয়েকটির গায়ে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। সকল ক্ষেত্রে যে মন্দির-নির্ম্মাতা স্বীয় নামধাম খোদাই করিয়া দিয়াছেন, তাহা নয়, বরং বহু ক্ষেত্রে মন্দির নির্ম্মাণের পরে কোন ব্যক্তিবিশেষ হয় ত মন্দিরের সংস্কার করিয়া স্বীয় কীর্ত্তির প্রমাণ স্বরূপ কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল শিলালিপি হইতে মন্দিরের প্রথম নির্ম্মাণকাল না পাইলেও আমরা ইহা অন্তত কত দিনের পুরানো, তাহা জানিতে পারি। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ সন-তারিখ জানা মন্দিরগুলিকে পর পর সাজাইয়া, তাহাদের লক্ষণ বিচার করিয়া, কালবশে ক্রমশ মন্দিরের রূপে কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বহু সাধকের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে এই উপায়ে আমাদের রেখ-মন্দিরের বিবর্ত্তনের সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা জন্মিয়াছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ফার্গুসন, হাভেল, কুমারস্বামী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্সি ব্রাউন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের কীর্ত্তি আমাদের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এতদ্ভিন্ন রমাপ্রসাদ চন্দ, স্টেলা ক্রামরিশ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সরসীকুমার সরস্বতী প্রভৃতি পণ্ডিতগণও উপরোক্ত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া রেখ-মন্দিরের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানের যে-সকল নূতন ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নিকটেও ঐতিহাসিকগণের ঋণ কম নয়।

১৯২২ সালে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় রত থাকিয়া ওড়িষায় ভ্রমণকালে রেখ-মন্দিরের সম্বন্ধে প্রথম আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়। সেই সময়ে রেখ-মন্দিরের বিভিন্ন অংশের নাম কি, কেমন করিয়া তাহা গড়া হয়, অর্থাৎ মন্দিরের শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে জানিবার জন্য আগ্রহ হয়। ফার্গুসনের পুস্তক যত্নসহকারে পড়িবার ফলে রেখ-মন্দিরের বিবর্ত্তনের সম্বন্ধে কিছু ধারণা হইলেও আমি যাহা খুঁজিতেছিলাম, সে সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত সংবাদ পাই না। তখন যে পুস্তকে প্রথম রেখ-মন্দিরের বিষয়ে নূতন আলোকের সন্ধান পাইলাম, তাহা ৺মনোমোহন

গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত Orissa and her Remains—Ancient and Mediaeval (1912)। সেই পুস্তকের সহায়তায় দীক্ষাগ্রহণ করিয়া আমি ওড়িয়া শিল্পিগণের সাহায্যে শিল্পশাস্ত্র এবং মন্দিরের তত্ত্ব আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করি। ক্রমশ বুঝিতে পারি যে, রেখ-মন্দির শুধু ওড়িষাতেই আবদ্ধ নয়, এমন কি, ইহার উদ্‌ভবও সম্ভবত এই প্রদেশে হয় নাই। কোথায় উদ্‌ভব হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত বলা কঠিন হইলেও আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন কাল হইতেই ওড়িষায় রেখ-মন্দির এক বিশেষ আকৃতি লাভ করিয়াছিল। সেই রূপের সহিত অপরাপর প্রদেশের রূপ তুলনা করিবার জন্য তখন রেখ-মন্দিরের সন্ধানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করি। ক্রমে ক্রমে বিহার ও ছোটনাগপুর, সংযুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতানা, বোম্বাই, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ এবং বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে নানাবিধ স্থানীয় লক্ষণবিশিষ্ট রেখ-মন্দিরের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।* কয়েকটি অঞ্চল আমার এখনও অদেখা আছে, যথা—গুজরাট, আলমোড়া, নেপাল, আসাম এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যের দক্ষিণাংশ। সেই সকল স্থানে পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হইলে রেখ-মন্দিরের স্থানীয় বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান আরও পরিপূর্ণ হইবে। যাহাই হউক, ভারতের নানা স্থান পরিদর্শনকালে উপলব্ধি করিলাম যে, অসংখ্য রেখ-দেউলের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক মন্দিরের দেহেই শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তখন প্রচলিত গবেষণারীতি ভিন্ন অপর কোনও উপায়ে মন্দিরের বিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যায় কি না, সে-বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করি।

নৃতত্ত্বের গবেষণায় কর্ম্মিগণকে দরিদ্র, অশিক্ষিত, বনবাসী জাতিসমূহের আচার ব্যবহার, সমাজ-পদ্ধতি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত নানাবিধ উপাদান বা আয়োজনের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হয়। মানব সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত এই সকল বস্তুর সন-তারিখ দেওয়া থাকে না; অথচ এক বিশেষ গবেষণা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সংস্কৃতির কোন্ অঙ্গ প্রাচীন, কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত নূতন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন। এই ভাবে মানুষের তৈয়ারি অস্ত্রশস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁড়িকুড়ি, এমন কি, পূজা পার্ব্বণের রীতি পর্য্যন্ত কালবশে কিরূপে কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া বিবর্ত্তিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ তাহা অনেকাংশে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং যে সকল প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রে মাটি খুঁড়িয়া পুরানো বসতির স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানে উপরে বর্ণিত গবেষণার দ্বারা লব্ধ সিদ্ধান্ত সত্য কি না, তাহা যাচাই করিবারও ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। আমেরিকাতে উইসলার, ক্রোবর, স্পিয়ার, নেলসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক পদ্ধতি অনুসারে গবেষণা করিয়া, আবার খনন-পদ্ধতির সাহায্যে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাহার সত্যাসত্য যাচাই করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলে আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার রূপ এবং বিবর্ত্তন সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

১৯২৪ সালে ভারতবর্ষের বসন্ত উৎসব, অর্থাৎ হোলি বা দোলযাত্রার ইতিহাস সম্পর্কে

---

* প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৮; আশ্বিন, ১৩৩৮, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮; মাঘ, ১৩৩৮; ভাদ্র, ১৩৪০; বৈশাখ, ১৩৪১ দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আমি আশাতীত ফল লাভ করি। ইহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া রেখ-মন্দিরের গবেষণাতেও সেই পদ্ধতি বা কৌশলটি প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা হয়। ফার্গুসন, কুমারস্বামী অথবা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দির-বিবর্তনের প্রাচীন গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন, আমার মনে হয়, স্বতন্ত্র গবেষণা-পদ্ধতির দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলে উভয়ের তুলনার দ্বারা আমার সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য যাচাই করা সহজে সম্ভব হইবে। এই কাজে এখনও ইচ্ছামত সাফল্য লাভ করিতে পারি নাই; তবু আপনাদের মত পণ্ডিতসমাজে অপরিপক্ক ফল পরিবেশন করিতে সাহসী হইয়াছি। আপনারা আজ আমাকে কৃপা করিয়া স্মরণ করিয়াছেন, তাই আমার এই দুঃসাহস। নতুবা নৃতত্ত্বের যে গবেষণা-পদ্ধতি আমি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি, তাহার জন্য সম্যক্ তথ্য আহরণের দুই আনা মাত্রাও আমার পক্ষে আজও সম্ভব হয় নাই। ইহা বিনয়ের বশে আপনাদিগকে বলিতেছি না; পদ্ধতিটি বর্ণনা করিলে এবং ওড়িষায় বিশেষভাবে কিরূপে আমি ইহা প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বলিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন—ইহার জন্য কত তথ্যের প্রয়োজন, এবং রেখ-মন্দিরের বিবর্তন সম্বন্ধে কি আশ্চর্য তত্ত্বের সন্ধানই না আমরা ইহার সহায়তায় লাভ করিতে পারি।

ওড়িয়া শিল্পিগণ মন্দির দেহকে মানব-দেহের সমতুল বলিয়া মনে করেন। মানুষের মত মন্দিরের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতি বর্ণভেদ আছে; এবং মানবশরীরের মত মন্দিরেরও পাদ, জংঘা, গণ্ডী (=দেহের মধ্যভাগ), বেকি (=গলা), খপুরি (=খর্পর) প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ আছে। প্রথমে আমাকে মন্দিরের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হয়। ওড়িষার বিভিন্ন মন্দিরের পাদ কি ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহাদের জংঘা কত প্রকারের হয়, গণ্ডীতে কি কি অলংকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার গড়ন কেমন ভাবে করা হয়, বেকি, আমলক, খপুরি এবং শীর্ষদেশের আকৃতি কত রকমের হইতে পারে, সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করি। ইহার পর এক একটি বিশেষ লক্ষণযুক্ত পাদ বা গণ্ডী, বিসম বা বাড় ধরিয়া কোন্ কোন্ মন্দিরে তাহা পাওয়া যায়, মানচিত্রের উপরে তাহা অঙ্কিত করিতে থাকি।

উদাহরণস্বরূপ, যে মন্দিরের বাড় ত্রি-অঙ্গবিশিষ্ট*, তাহা মানচিত্রে লিখিবার সময়ে দেখা গেল যে, শুধু ওড়িষায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর জেলায় আইহোলি এবং পট্টাদকল গ্রামদ্বয়ে, হিমালয়ের কাংড়া জেলায়, রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে ওসিআঁ গ্রামে ঐরূপ বাড়বিশিষ্ট মন্দির আছে। অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা যায় বটে, কিন্তু উপরের সকল স্থানেই ত্রি-অঙ্গবিশিষ্ট বাড়যুক্ত মন্দির রহিয়াছে। তেমনই আবার পাভাগ তিন অথবা চার অথবা পাঁচ কাম বিশিষ্ট, তাহার মানচিত্র অঙ্কন করি। কোন কোন

---

* এই সকল শব্দের অর্থবোধের জন্য Canons of Orissan Architecture (1932) পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য। তৎসহ 'কণারকের বিবরণ' (১৩৩৩) হইতেও সাহায্য পাওয়া যাইবে।

মন্দিরের সম্মুখভাগে রাহা অতিমেলিত হয় এবং সেখানে গোলাকার ভোর মধ্যে নৃত্যশীল শিবের বিশেষ কোন মূর্ত্তি খোদিত থাকে। এই লক্ষণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, তাহাও মানচিত্রে লিখি। বহু মন্দিরের বিসম পগ-বিভক্ত নয়, অনেকগুলি আবার পগ-বিভক্ত, উভয়ের অবস্থান মানচিত্রে সাজাই। কোন কোন রেখ-মন্দিরের রাহা উপরে শৃঙ্গপ্রায় হইয়া আমলককে স্পর্শ করিয়া থাকে; এই লক্ষণটিকেও মানচিত্রে সাজাইয়া ফেলি। এইরূপ চেষ্টার দ্বারা ক্রমশ উপলব্ধি করিলাম যে, রেখমন্দিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন লক্ষণগুলি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এলোমেলোভাবে দেখা যায় না, বরং তাহাদের ব্যাপ্তিতে কতকগুলি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

ত্রি-অঙ্গ বাড় উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব-ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। আমলকচুম্বী শৃঙ্গ-প্রায় রাহা যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা, মধ্যভারত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে বিজাপুর জেলা পর্যন্ত শাখা বিস্তার করিয়াছে। পঞ্চাঙ্গ বাড় ওড়িষা এবং মানভূমের একটি মন্দিরে দেখা যায়। হিমালয়, রাজপুতানা বা বুন্দেলখণ্ডে মন্দিরের গড়ন উঁচু করিবার ফলে সেখানেও বাড়কে দুই বা তিন জাংঘে বিভক্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেরূপ বাড়ের সহিত ওড়িষার পঞ্চাঙ্গ বাড়ের মধ্যে কিছু তারতম্য লক্ষিত হয়। একই প্রয়োজনের বশে দুই ক্ষেত্রে বাড়ে অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে; এবং দুইটির জন্য পৃথক্ ব্যাপ্তির মানচিত্র রচনা করিতে হইবে। নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপ বিবর্ত্তনের (parallel evolution) প্রমাণ কোথাও কোথাও পাইয়া থাকি।

যাহাই হউক, মানচিত্রের সাহায্যে রেখ-মন্দিরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যাপ্ত বা বিস্তারের তুলনা করিয়া আমরা পরীক্ষা করি, কোন্ লক্ষণ ভারতব্যাপী, কোন্‌টির ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, কোন্‌টি বা ক্ষুদ্র সীমারেখার দ্বারা আবদ্ধ। নৃতত্ত্বের গবেষণার ফলে মোটামুটি স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সমশ্রেণীর লক্ষণ-নিচয়ের মধ্যে যদি একটি বহুব্যাপ্ত হয় তাহার উৎপত্তিও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালে সংঘটিত হইয়াছিল, এবং তাহার তুলনায় যে লক্ষণটি সংকীর্ণ দেশে আবদ্ধ, তাহার উৎপত্তি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে হইয়াছিল, এরূপ মনে করা সংগত।

এই সূত্র অনুসারে ওড়িষার মন্দির-বিবর্ত্তনের যে ধারাটি ক্রমশ চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে, তাহা এইবার বর্ণনা করি। প্রথমে ত্রি-অঙ্গ বাড়বিশিষ্ট, মধ্যম অথবা অতিমেলান বিশিষ্ট ছামু-রাহা-সংযুক্ত, অবিভক্ত বিসম-সমন্বিত রেখ-মন্দির ওড়িষায় রচিত হইত। তাহার পাদ তিন কামযুক্ত এবং কুম্ভের পরিবর্ত্তে নোলিসংযুক্ত। গণ্ডী ত্রিরথ; কনিক বহুবিস্তৃত। ঐরূপ কনিক কদাকার দেখাইতে পারে বলিয়া মধ্যভাগে উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত একটি অংশ খাঁজ কাটিয়া দেওয়া হইত। ভূমি-আঁলা গোলাকার না হইয়া চতুষ্কোণের মত ছিল; মস্তকে কলসের পরিবর্ত্তে লিঙ্গাকার এক বস্তু থাকিত; শাস্ত্রানুযায়ী ইহার কোনও নাম এখনও পাওয়া যায় নাই। গর্ভ হইতে জলনিকাশ একটি নাগমূর্ত্তির হস্তে ধৃত কলসের ভিতর দিয়া হইত।

মন্দিরের গর্ভের তুলনায় উচ্চতা ৩॥০ গুণ হইতে ৪ গুণের কাছাকাছি হইত। মন্দিরের অন্তর মুদ-যুক্ত ছিল না, নীচে হইতে বেকির তল পর্য্যন্ত লহরী-সংযুক্ত ছিল।

পরবর্ত্তী কালে মন্দিরের উচ্চতা ক্রমে বাড়িতে লাগিল, হয় ত যজমানের ঐশ্বর্য বাড়িয়াছিল এবং শিল্পিগণেরও দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ছোট মন্দির যে কৌশলে গড়া চলে, বড় মন্দিরের বেলায় তাহার ইতরবিশেষ করিতে হয়। ফলে মন্দির যত উঁচু হইতে লাগিল, ভিতরে গড়নেও সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। প্রথমে একটি চওড়া পাথরের পাটা দিয়া গর্ভের উপরে দুইটি বিপরীত দেওয়ালের মধ্যে বাঁধন দেওয়া হইত। পাশের ফাঁক পাৎলা পাৎলা পাথরের পাটা দিয়া মুদ্রিত করা হইত। পরে কিন্তু দুই দেওয়ালের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত অংশটি কয়েক খণ্ড মোটা চওড়া পাথরের সাহায্যে বুজাইয়া দেওয়া হইত। শিল্পীদের ভাষায় ইহার নাম গর্ভমুদ। ক্রমে গর্ভমুদ এবং বেকির মধ্যে রত্নমুদ নামে আরও একটি কামরা দেখা দিল। তাহার পর আবার বড় বড় পাথরের পাটার পরিবর্ত্তে লহরীসংযুক্ত একাধিক মুদের (corbelled arches instead of broad slabs of stone) ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল।*

মন্দিরের অন্তর গঠনে যেমন পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে লাগিল, মন্দিরের উচ্চতা যেমন গর্ভের অনুপাতে তিনগুণ হইতে পাঁচগুণ বা ততোধিক সংখ্যায় পৌঁছিল, তেমনই আবার বাহিরের সাজেও ক্রমশ নানাবিধ পরিবর্ত্তন দেখা দিতে লাগিল। পাদ তিনকাম হইতে চারকাম, চারকাম হইতে পাঁচকামে দাঁড়াইল। নোলি ক্রমে কুম্ভে রূপান্তরিত হইল, জংঘাকে বান্ধনার দ্বারা বিভক্ত করা হইল; বিস্তৃত দেহকে ত্রিরথের পরিবর্ত্তে পঞ্চ, সপ্ত অথবা নবরথে বিভক্ত করা হইল; বিসম পগবিভক্ত হইল। এইরূপ নানা পরিণতির মধ্য দিয়া মন্দিরের ক্রমবর্দ্ধমান উচ্চতা বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

উপরে যে পদ্ধতির অতি ক্ষীণ আভাস আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে প্রথমে প্রতি মন্দিরের শিল্পশাস্ত্রানুসারে বিশ্লেষণের প্রয়োজন। তৎপরে মন্দিরগুলিকে সম্ভব হইলে থিওডোলাইট যন্ত্রের সাহায্যে মাপা প্রয়োজন। ৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ভিন্ন অপর কেহ ভারতবর্ষে এই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না। তাঁহার প্রদর্শিত বিশ্লেষণপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আমি সামান্য সেক্সট্যাণ্ট, এব্নীর হ্যাণ্ড-লেভেল ও ফিতার সাহায্যে ওড়িষার কিছু মন্দির মাপিয়াছি। এরূপ যন্ত্রের সাহায্যে একা দ্রুত মাপের কাজ সারিলে ভুল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবু না মাপা অপেক্ষা কিছু মাপও ভাল, ইহা স্মরণ করিয়া সেক্সট্যাণ্ট-লব্ধ অঙ্কের সাহায্যে শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী মন্দিরগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাত নির্দ্ধারণ করিয়াছি। তাহার ফলে বিবর্ত্তনের যে আভাস অতি অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহাই আপনাদের মত সুধী জনের সম্মুখে জ্ঞাপনের সুযোগ লাভ করিয়া আজ নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিতেছি।

* 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪৬শ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৯১ দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতি রেখ-মন্দিরকে শিল্পশাস্ত্রানুসারে তন্ন তন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক হইয়াছে। তৎপরে প্রতি অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গের লক্ষণ ধরিয়া, এমন কি, বিভিন্ন অঙ্গের অনুপাত কোন্ কোন্ মন্দিরে কিরূপ, তাহা দেখিয়া, ব্যাপ্তিসূচক মানচিত্রে লিখিতে হইবে। সেই ব্যাপ্তি-চিত্রগুলিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রেখ-মন্দিরের মধ্যে কালক্রমে কোন্ লক্ষণের পর কোন্ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার পরেই আরম্ভ হইল কঠিন কাজ। লক্ষণের পর লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, মন্দিরের দেহে রূপান্তর সাধিত হইতেছে, এইটুকু জানিয়াই আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি না। রূপান্তরের হেতু কি, তাহাও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ওড়িষায় একটি কারণের আভাস দিয়াছি : মন্দির কালবশে উচ্চ হইতেছে, বিস্তৃত হইতেছে, এবং তাহারই সহিত সংগতি রাখিয়া উহার অন্তর এবং বহিরঙ্গ রূপান্তরিত হইতেছে। ওড়িষার সমাজে ধনসঞ্চার হইয়াছিল, রাজা ছোট মন্দিরের পরিবর্ত্তে বড় মন্দির গড়িবার জন্য হয় ত শিল্পীকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাই যে সবটুকু নয়, আমরা তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাই।

শিল্পিগণ বড় মন্দির রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মন্দিরের বৃহৎ রূপের ভিতর দিয়া, অর্থাৎ শিল্পের ভাষার সাহায্যে তাঁহারা কতকগুলি ভাবকেও প্রকাশ করিতেন। খাজুরাহোর মন্দিরের শিল্পীও ওড়িষার মত সু-উচ্চ মন্দির গড়িতেন, কিন্তু তাহার শিল্পগত ব্যাখ্যানবস্তু ছিল ওড়িষার শিল্পিগণের ব্যাখ্যানবস্তু হইতে স্বতন্ত্র। ওড়িষার শিল্পী বিশ্বের মধ্যে যে বিশাল সর্ব্বব্যাপী, মানবজীবনের সর্ব্বরসগ্রাহী সৌন্দর্য্য ফুটিয়া ওঠে, তাহাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজুরাহোর শিল্পী তৎপরিবর্ত্তে অপরিণত যৌবনচাপল্যে উদ্বেল ভাবধারাকে মন্দিরের সাহায্যে রূপায়িত করিয়াছিলেন।* তাহার ফলে মন্দিরের দেহে, রেখায়, অলংকারে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা ওড়িষায় সচরাচর দেখা যায় না। ওড়িষার শিল্পিগণ মন্দিরদেহে ঊর্দ্ধগামী রেখাকে আশ্রয় করিলেও ধরিত্রীর সহিত মন্দিরের সংযোগকে কখনও ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। তাঁহারা অঙ্গশিখরগুলিকে কখনও মূল রেখ-মন্দিরের রেখাকে আচ্ছাদিত করিতে দেন নাই। গভীর গতির সহিত তাল রাখিয়া, বরং তাহার গাম্ভীর্য্যকে আরও পরিপুষ্ট করিবার জন্যই অঙ্গশিখর ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলে ওড়িষার রেখ-মন্দিরে যে গাম্ভীর্য্য, প্রশান্তি ও দৃঢ়তার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা খাজুরাহোর অতিরিক্ত শিখর-মণ্ডিত, পিষ্টের পর পিষ্ট, পাভাগের পর পাভাগ, জঙ্ঘার পর জঙ্ঘাসমন্বিত চঞ্চল গতিবিশিষ্ট, যৌবনসুলভ অসহিষ্ণুতার ভাবযুক্ত কাণ্ডারিয়া মহাদেবের মন্দিরে কখনও পাওয়া যায় না।

আমার বলার তাৎপর্য্য এই যে, মন্দিরের রূপের বিবর্ত্তন শুধু গঠন-কৌশলের প্রয়োজনবশেই সাধিত হয় নাই, ক্ষেত্রবিশেষে শিল্পীর শিল্পানুভূতির প্রভেদের কারণেও তাহার তারতম্য

* ইহার জন্য "নবীন ও প্রাচীন" (১৩৩৭), পৃ. ৩০-৩৯; "প্রবাসী", কার্ত্তিক, ১৩৪০, পৃ. ১২-১৭; *The Visva-Bharati Quarterly*, Aug, 1935, পৃ, ৫৭-৬৪; ঐ, Nov, 1935, পৃ. ৭৩-৭৫; *4 Arts Annual, 1936-37*, পৃ. ২০-২৫ দ্রষ্টব্য।

ঘটিয়াছে। অতএব সারা ভারতের রেখমন্দিরগুলিকে মাপিবার পর, বিশ্লেষণ, তুলনা এবং ব্যাপ্তিপরীক্ষার সাহায্যে আমরা যেমন তাহার বহিরঙ্গের বিবর্ত্তনের চিত্রটি প্রকাশ করিব, তেমনই আবার গূঢ় মর্ম্মকথার সম্বন্ধেও আমাদিগকে সজাগ থাকিতে হইবে। কোথাও হয় ত রূপবিবর্ত্তনের কারণ হইল মন্দিরকে আরও উঁচু করিয়া গড়ার আকাঙ্ক্ষা; কোথাও বা পাথরের পরিবর্ত্তে ইট ব্যবহারের ফলে রূপভেদ ঘটিয়াছে; আবার কোথাও হয় ত দেখা যাইবে, শিল্পের অন্তর্নিহিত ভাবধারার তারতম্যের কারণে বহিরঙ্গে বিশেষ বিশেষ বিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।*

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রেখ-দেউলের বিবর্ত্তনের সমগ্র চিত্রটি যখন বহু ঐতিহাসিকের চেষ্টার দ্বারা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে, তাহার পর ফার্গুসন, হাভেল, কুমারস্বামী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের পদ্ধতি অনুসারে লব্ধ সিদ্ধান্তের তুলনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারিব, নৃতত্ত্বে ব্যবহৃত গবেষণাপদ্ধতির সার্থকতা কতটুকু। হয়ত তখন দেখা যাইবে যে, উল্লিখিত মহাত্মগণের বহু পরিশ্রমলব্ধ অমূল্য ইতিহাসরচনাকে আমাদের চেষ্টার দ্বারা কিছু নূতন তথ্যসঙ্কলনের ফলে আরও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। সেইটুকু কাজে সমর্থ হইলে নিজের পরিশ্রমকে আমরা সার্থক বলিয়া মনে করিতে পারিব।†

---

* *The Calcutta Review*, Oct, 1935, পৃ, ২৫-২৮ দ্রষ্টব্য।

† ১৪ই বৈশাখ ১৩৫৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার বিতরণী সভায় পঠিত।

বালবলভীভুজঙ্গ ভট্ট ভবদেব

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

চতুর্বদনসদ্মস্থ-চতুর্ব্বেদকুটুম্বিনে।
দ্বিজানুষ্ঠেয়-সৎকর্ম্মসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥

বঙ্গদেশে সামবেদীয় বিবাহাদি-সংস্কারের অনুষ্ঠানকালে এখনও ঘরে ঘরে ভবদেব-রচিত কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতির উদ্ধৃত মনোহর মঙ্গলাচরণ-শ্লোক আবৃত্তি করিয়া পুরোহিতগণ কুশণ্ডিকাদি যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। শ্লোকটি ব্রহ্মার নমস্কারস্বরূপ। ভারতীয় সাধনার বিচিত্র ইতিহাসে ব্রহ্মা কোন উপাসক-সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা নহেন—তিনি দ্বিজানুষ্ঠেয় বেদোক্ত সৎকর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ বলিয়াই ভবদেব বিষ্ণুভক্ত[১] হইয়াও তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন। নবদ্বীপের "নবদ্বৈপায়ন" স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন চেষ্টা করিয়াও ভবদেবপদ্ধতির সংশোধন-কার্য্যে সফলকাম হইতে পারেন নাই। রঘুনন্দনের "সংস্কারতত্ত্ব" ও "সংস্কারপ্রয়োগতত্ত্বে"র পরিবর্ত্তে ভবদেবপদ্ধতিই প্রতি গৃহে প্রচার লাভ করিয়াছিল। আট শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন প্রচারলাভ ভারতীয় অন্য কোন স্মার্ত্ত গ্রন্থকারের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। সৌভাগ্যক্রমে ভট্ট ভবদেবের সম্বন্ধে বহু তথ্য কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার উৎকৃষ্ট বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (J. A. S. B., 1912, pp. 333-48)। বর্ত্তমানে নূতন গবেষণার ফলে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধের পরিপূরণ এবং সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে।

ভবদেবের গ্রন্থপঞ্জী

১। **তৌতাতিতমততিলকম্ঃ** কাশীর সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় এই গ্রন্থ সম্প্রতি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। কুমারিল ভট্টের "তন্ত্রবার্ত্তিক" (অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনের ১।২ হইতে ৩।৪ পাদ পর্য্যন্ত) গ্রন্থের উপরি ইহা একটি প্রকরণগ্রন্থ—ধারাবাহিক টীকা নহে। মীমাংসাশাস্ত্রীয় অধিকরণসমূহের পঞ্চাঙ্গ-পরিপূর্ণ অতিবিশদ ব্যাখ্যা এবং স্থানে স্থানে প্রভাকরসম্প্রদায়ের মতখণ্ডন এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার বাহিরে ভবদেবের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি এই গ্রন্থের উপরই দীর্ঘকাল সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশে ভট্ট-মীমাংসা ও প্রভাকর-মীমাংসার পঠন-পাঠনা প্রচলিত ছিল এবং এক সময়ে রাঢ়দেশই প্রভাকরসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল। "প্রকরণপঞ্চিকাকার শালিকানাথ এবং

১। প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণের প্রারম্ভে ভবদেব 'বাসুদেবে'র নমস্কার এবং তিলকগ্রন্থে বিষ্ণু ও সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন। তদীয় সুহৃৎ বাচস্পতির প্রশস্তিলিপিতেও বাসুদেবের বন্দনা ও ভবদেবনির্ম্মিত নারায়ণ-মন্দিরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ভবদেব বৈষ্ণব ছিলেন সন্দেহ নাই।

"নয়রত্নাকর"কার মহামহোপাধ্যায় চন্দ্র বাঙ্গালী ছিলেন।[২] প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে (রচনা-কাল প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ) "দক্ষিণরাঢ়া"-নিবাসী অহঙ্কার কাশীতে আসিয়া যে দর্পোক্তি করেন, তন্মধ্যে তৎকালীন বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থিগণের একটি মূল্যবান্ পাঠ্য পুস্তকতালিকা লিপিবদ্ধ আছে—যাহার অধ্যাপনা কাশী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল না।

অহো মূর্খবহুলং জগৎ।

নৈবাশ্রাবি **গুরোর্মতং** ন বিদিতং **তৌতাতিতং** দর্শনং
তত্ত্বং জ্ঞাতমহো ন **শালিকগিরাং বাচস্পতেঃ** কা কথা।
সূক্তিনৈব **মহোদধেরধিগতা মাহাব্রতী** নেক্ষিতা
সূক্ষ্মা বস্তুবিচারণা নৃপশুভিঃ স্বস্থৈঃ কথং স্থীয়তে। (২য় অঙ্ক)

এই শ্লোকে "গুরু"-মতের প্রথম উল্লেখ দ্বারা প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের টীকাকার নাণ্ডিল্লগোপ (নির্ণয়সাগর-সংস্করণ দ্রষ্টব্য) এ স্থলে গ্রন্থরাজির অতি প্রামাণিক বিবরণ দিয়াছেন (৩য় সং, পৃ. ৫৩)। প্রভাকর গুরুর গ্রন্থদ্বয় "নিবন্ধন" ও "বিবরণ"। তদুপরি শালিকানাথের টীকাদ্বয় "ঋজুবিমলা" ও "দীপশিখা"। মহোদধি হইলেন "শালিকনা(থ)-সহব্রহ্মচারী গুরুমতে নিবন্ধনকর্ত্তা **ভবনাথ**-বৎ"—তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "সিদ্ধান্তরহস্যম্"। মহাব্রত হইলেন "ভট্টমতানুবর্ত্তী মহোদধি-প্রতিপ্রস্পর্দ্ধী **ভবদেব**-বৎ।" টীকাকারের সময়েও (১৬শ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পাদে) ভট্টমতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকাররূপে ভবদেবের নাম প্রসিদ্ধ ছিল এবং টীকার ভাষা হইতে মনে হয়, ভবনাথ ও ভবদেব সমকালীন ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ভবদেবের ন্যায় ভবনাথও বাঙ্গালী হওয়া বিচিত্র নহে। ভবনাথের "নয়বিবেক" গ্রন্থের তর্কপাদ মুদ্রিত হইয়াছে (মাদ্রাজ সং, ১৯৩৭)। গ্রন্থমধ্যে শ্রীকর (পৃ. ২৭১), মহোদধি (পৃ. ২৭১), মহাব্রত (পৃ. ২৭৩) ও বাচস্পতির (পৃ. ২৭৫) নাম পাওয়া যায়। মৈথিল স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্রের সময়ে (খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে) ভবদেবের এই গ্রন্থ পরম প্রমাণরূপে পরিগণিত ছিল। বাচস্পতির বিচারবহুল "দ্বৈতনির্ণয়" গ্রন্থে পাওয়া যায়:—"ইতি চেন্ন, **তৃতীয়াধ্যায়-ভবদেব**-বিরোধাৎ, তথা চ ভবদেবফক্কিকা…" (দারভাঙ্গা সং, পৃ. ১৩)।

২। কাব্যপ্রকাশের টীকাকার চণ্ডিদাস (খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) এক স্থলে লিখিয়াছেন:— "যদি তু প্রাভাকরৈঃ সার্দ্ধং বিজিগীষুকথাকণ্ঠদুর্দ্দুরো দেহগুদা তামেব মৃগয়িঃ;ং **রাঢ়াদি**রাষ্ট্রং গচ্ছেতি।" (কাব্যপ্রকাশ-দীপিকা, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির G. 3783 সংখ্যক পুথির ৭ ক পত্র, পঞ্চমোল্লাস) চণ্ডিদাস উৎকলবাসী ছিলেন। কুসুমাঞ্জলির টীকাকার (কাশ্মীরনিবাসী) বরদরাজ উদয়নোক্ত "গৌড়মীমাংসক"কে "পঞ্জিকাকারঃ" (কুসুমাঞ্জলিবোধনী, কাশী সং, পৃ. ১২৩) অর্থাৎ শালিকানাথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্র "নয়রত্নাকর" গ্রন্থে পরিচয় দিয়াছেন:— "অসৌ চন্দ্রঃ শ্রীমানকৃত নয়রত্নাকরমিমং, নিবদ্ধং **পোশালী**কুলকমল-কেদারমিহিরঃ।" (H. P. Sastri : Nepal Cat. I, p. 113) "পোশালী" রাঢ়ীয় কাশ্যপগোত্র শ্রোত্রিয়বংশ, বর্ত্তমানে পুষিলাল নামে পরিচিত। এই চন্দ্ররচিত 'অমৃতবিন্দু' প্রকরণ বিধিবাদ ও অপূর্ব্ববাদ বিষয়ে গঙ্গেশের অন্যতম উপজীব্য ছিল।

গ্রন্থারম্ভে ভবদেব লিখিয়াছেন :—

অক্লিষ্টা নৈব সুবোধা, সংক্ষিপ্তং নাঽ**ন্বনুপদম্** অতো লোকাঃ।
(বি-)হতোৎসাহা জাতা ন জানতে তন্ত্রটীকার্থম্। ৪ শ্লোক

অর্থাৎ তন্ত্রবার্ত্তিকের তৎকালপ্রচলিত প্রাচীন টীকাদ্বয়ের একটি দুর্ব্বোধ এবং অপরটি বিস্তৃত ছিল। তজ্জন্য সংক্ষেপে অথচ উচিত বাক্যবিন্যাসে ("উচিতসুবর্ণোপরচিতমল্পং চ" ৫ম শ্লোক) ভবদেব এই "তিলক" গ্রন্থ লিখিয়াছেন। পরিতোষ মিশ্র-রচিত অজিতাগ্রন্থের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে (R. 368 প্রভৃতি)। ইহাই বোধ হয়, তন্ত্রবার্ত্তিকের প্রাচীনতম টীকা। "অনুপদ" গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, ইহা পূর্ব্বোক্ত মহাব্রত-রচিত হইলেও হইতে পারে। ভবদেবের এই গ্রন্থে কতিপয় নূতন তথ্যের উল্লেখ আছে। আমরা দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(ক) দৃশ্যন্তে চাগুবেপি বেদব্যবহারিণামেব ধর্ম্মবোধেঽনাচারাঃ স্মৃতিবিরুদ্ধাঃ। যথা দাক্ষিণাত্যব্রাহ্মণীনামনুমরণম্। তথা চ স্মরন্তি,

মৃতানুগমনং নাস্তি ব্রাহ্মণ্যা ব্রহ্মশাসনাৎ।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং স্ত্রীধর্ম্মোঽয়ং ব্যবস্থিতঃ। (পৃ. ১০০)

(খ) দুর্গোৎসব এব বরাটাদৌ (? **রাঢ়াদৌ** হইবে) জম্বালকীলানুষ্ঠানং, **বঙ্গ-পাশ্চাত্যানাং** তু চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যামেব। (পৃ. ১২৩)

জম্বাললীলা অর্থাৎ পঙ্কোৎসব এখনও বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে দুর্গাপূজার সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশী অর্থাৎ মদনচতুর্দ্দশীর উৎসব বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে।

২। **প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্ :** বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে ইহা একটি আকর বটে। ভবদেব এই গ্রন্থে এক স্থলে মাত্র "জিকনে"র মত উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১০২), কিন্তু শূলপাণি প্রায়শ্চিত্তবিবেক গ্রন্থে জিকনের সন্দর্ভ বহু বার (অন্ততঃ ২৩ বার) উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভবদেব এই গ্রন্থে যে সকল পূর্ব্বতন নিবন্ধকারের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে "ধারেশ্বর" (পৃ. ৮২) অর্থাৎ ভোজদেব ব্যতীত সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়—জিকন, বালক, বিশ্বরূপ (পৃ. ৮২) ও শ্রীকর। এই বিশ্বরূপ একজন অনতিপ্রাচীন নিবন্ধকার এবং যাজ্ঞবল্ক্যের সুপ্রাচীন টীকাকার বিশ্বরূপাচার্য্য হইতে পৃথক্। দুই জনকে অভিন্ন ধরিয়া অনেকেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। জিকন ব্যতীত বাঙ্গালার এই সকল প্রাচীন নিবন্ধকারের নাম জীমূতবাহনও তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, জীমূতবাহনের দায়ভাগ অধ্যাপনাকালে নবদ্বীপের কোন কোন অধ্যাপক একটি প্রাচীন প্রবাদের উল্লেখ করিতেন যে, শ্রীকর জীমূতবাহনেরই পিতৃস্বসাপতি ছিলেন এবং বিশ্বরূপও তাঁহার নিকট-আত্মীয় ছিলেন। এই শ্রীকর—ভবনাথ, গঙ্গেশ প্রভৃতি দ্বারা উল্লিখিত (ভট্টমতাবলম্বী) কুব্জশক্তিবাদী মীমাংসকাচার্য্য শ্রীকর হইতে অভিন্ন হইতেও পারেন।

৩। **সম্বন্ধবিবেক**ঃ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধও মুদ্রিত হইয়াছে (New Indian Antiquary, Vol. V1., No. 8), রঘুনন্দন ও কামরূপীয় পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ (প্রেতকৌমুদী, পৃ. ১৫৭) এই গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পুষ্পিকায় যথাযথ ভবদেবের উপাধি "বাল-বলভী-ভুজঙ্গ" লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং ভবদেবের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

৪। **কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি**ঃ এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বহু বার মুদ্রিত হইলেও ইহার কোন প্রামাণিক সংস্করণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত রামনাথ বিদ্যা-বাচস্পতি "সংস্কারপদ্ধতিরহস্য" নামে এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। (L. 2177, রচনাকাল ১৫৪৪ শক = ১৬২২-৩ খ্রীঃ) এই গ্রন্থোক্ত ভবদেবের কতিপয় মত গৌড়ীয় স্মার্ত্তসম্প্রদায়ে বিতর্কের অবতারণা করে। একটি স্থল উল্লেখযোগ্য। ভবদেবের মতে "পাহি নো অগ্ন এনসে স্বাহা" প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা প্রায়শ্চিত্তহোমের ব্যবস্থা আছে এবং প্রকৃতকর্ম্মের বৈগুণ্যসমাধানার্থ "শাট্যায়ন" হোম করিতে হয়। উভয় স্থলেই ভবদেবের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী গোভিলভাষ্যকার ভট্ট-নারায়ণ তীব্রভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। যথা,"অত্র কেচিদ্‌যজ্ঞতন্ত্রানভিজ্ঞাঃ পাহি নো অগ্ন এনসে স্বাহেত্যাদিকং প্রায়শ্চিত্তমধিকং কুর্ব্বন্তি, তৎ তেষাং বাল-ক্ষেড়িতবদনর্থকং মন্যামহে। কুতঃ? শ্রুতাবিহ চ তস্যানুপদেশাৎ। যদপি শাট্যায়নকং কুগ্রন্থান্তরম্ অপপাঠভূতমধীয়তে, তদপ্যপ্রমাণম্। কুতঃ? অনার্ষেয়ত্বাচ্চ পরিশিষ্টমধ্যান্তঃপাতিত্বাসংভবাচ্চ তস্য।" (গোভিলভাষ্য, কলিকাতা সংস্কৃতগ্রন্থমালা সং, পৃ. ২২৩-৪) ভবদেবের সুপ্রসিদ্ধ উপাধি বালবলভীভুজঙ্গের উপর কটাক্ষ করিয়াই এ স্থলে "বাল-ক্ষেড়িতবৎ" লিখিত হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং 'কুর্ব্বন্তি' ও 'অধীয়তে' পদের বর্ত্তমান কালে প্রয়োগদ্বারা সূচিত হয় যে, ভবদেবের জীবদ্দশায়ই ভট্ট নারায়ণ ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ভট্ট-নারায়ণও সুতরাং গৌড়দেশীয় বলিয়াই অনুমান করা যায়। রঘুনন্দন এ স্থলে ভট্ট-নারায়ণের মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিথিতত্ত্বের দুর্গোৎসব-প্রকরণের শেষে পাওয়া যায়:—"যত্তু প্রকৃতবৈগুণ্যদোষপ্রশমনায় শাট্যায়নহোমাভিধানং ভবদেবভট্টসম্মতং, তন্ন, তস্মাদপি মহাপ্রামাণিকৈর্ভট্টনারায়ণচরণৈর্গোভিলভাষ্যে তদপ্রমাণী-কৃতত্বাৎ……।" উভয়ের প্রামাণ্য বিষয়ে তারতম্যের কোন সূত্র পাইয়াই রঘুনন্দন উক্তরূপ স্পষ্টোক্তি করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টপ্রকাশ ও সময়প্রকাশকার "কাঞ্জিবিল্লীয়" নারায়ণোপাধ্যায় ভট্ট-নারায়ণ হইতে পৃথক্ এবং পরবর্ত্তী।

৫। ভবদেবের বহুতর গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল **ব্যবহার-তিলক**। মিসরু মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, নব্যবর্দ্ধমান প্রভৃতি মৈথিল এবং রঘুনন্দন (ব্যবহার-তত্ত্বে) প্রভৃতি গৌড়ীয় বহু গ্রন্থকার এই গ্রন্থের প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই গ্রন্থের প্রতিলিপির সন্ধান পাইয়াছিলেন (Proc. A. S. B., May 1869, p. 130), কিন্তু এখনও ইহা অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভবদেব-রচিত 'দত্তকতিলকে'র যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা প্রামাণিক নহে (প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণের Introd. pp. 2-3 দ্রষ্টব্য)।

৬। ভবদেবের অপর প্রসিদ্ধ অথচ অধুনাবিলুপ্ত গ্রন্থের নাম **নির্ণয়ামৃত**। এই মূল

গ্রন্থের সহিত পার্থক্য সূচনার জন্য রঘুনন্দন "পাশ্চাত্য-নির্ণয়ামৃত" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। 'পাশ্চাত্য' বিশেষণ হইতেই প্রতিপন্ন হয়—মূল গ্রন্থটি গৌড়ীয়। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে অনিরুদ্ধ-রচিত "কর্ম্মোপদেশিনী" গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি আছে (Eggeling : I. O. Cat. pp. 474-5 ; পত্রসংখ্যা ১-৮২); তাহার সহিত সংযুক্ত দুইটি পৃথক্ গ্রন্থ আছে—একটি কোন অজ্ঞাতনামা (মৈথিল ?) গ্রন্থকারের শুদ্ধিপ্রকরণ (পত্রসংখ্যা ৮২-১১৪) এবং অপরটি সুপ্রাচীন গৌড়ীয় স্মার্ত্ত বলভদ্র-রচিত "অশৌচসার" (পত্রসংখ্যা ১১৫-২৪)। শুদ্ধিপ্রকরণের এক স্থলে আছে—**নির্ণয়ামৃতে ভবদেবভট্টঃ** (৮৪ ক পত্র)। রঘুনন্দন-রচিত "আহ্নিকাচারতত্ত্বে"র একটি প্রতিলিপির পার্শ্বে নিম্নলিখিত সন্দর্ভ আমরা পাইয়াছিলাম :—

"তথা চ **ভবদেবীয়নির্ণয়ামৃতে** স্মৃতিঃ

রাত্রেঃ পশ্চিমযামস্থ মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।

স ব্রাহ্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো বিহিতঃ সম্প্রবোধনে ॥" (প্রথম পত্রে)

নির্ণয়ামৃতের বচন মলমাসতত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব, কৃত্যতত্ত্ব ও শ্রাদ্ধতত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭। **তিথিনির্ণয় :** এই বিলুপ্ত গ্রন্থের বচন রায়মুকুট-রচিত "স্মৃতিরত্নহারে" উদ্ধৃত হইয়াছে (I. H. Q., XV11, p. 460)। যথা,

ভবদেবেনাপি তিথিনির্ণয়ে উক্তম্ (৩৪ ক পত্র)।

তথা চ **তিথিনির্ণয়ে ভবদেবেন** ·········· (১৫০ খ পত্র)।

এই গ্রন্থ নির্ণয়ামৃতের পরিচ্ছেদও হইতে পারে।

৮। নিশ্চল কর-রচিত চক্রদত্তসংগ্রহটীকায় **ভবদেবীয়গন্ধশাস্ত্রের** উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পুনার ১৮৯৫-১৯০২ সনের ৬২০ সংখ্যক পুথির ২০০ ক ও ২৩২ ক পত্র দ্রষ্টব্য। প্রশস্তিকারের মতে ভবদেব জ্যোতিষাদিশাস্ত্রেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

বালবলভীভুজঙ্গ উপাধি

ভবদেবের উপলভ্যমান গ্রন্থে এবং কুলপ্রশস্তিতে তাঁহার বিচিত্র উপনাম বালবলভীভুজঙ্গ লিখিত আছে। পদটির অর্থ দুরূহ। অনেকের মতে "বালবলভী" ঐ নামের স্থানবিশেষ হইতে অভিন্ন—রামচরিতে তাহার উল্লেখ আছে। ভবদেব তৎস্থানের অধিবাসী বলিয়া এই উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু স্থাননামের সহিত অব্যবধানে সংযুক্ত 'ভুজঙ্গ' শব্দ কোন সদর্থেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। বারবিলাসিনী কিম্বা ঐরূপ কোন পদ ব্যবধানে থাকা আবশ্যক। কাব্যপ্রকাশের কোন কোন টীকাকার অজ্ঞতাবশতঃ অভিনবগুপ্তপাদকে ভবদেবের উক্ত উপাধির পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, গুপ্তপাদ শব্দ সর্পবাচক ভুজঙ্গের সমার্থক। শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভট্টাচার্য্যরচিত কাব্যপ্রকাশের সারবোধিনী টীকায় আছে,— "অভিনবগুপ্তপাদা ইতি চ তস্য বালবলভীভুজঙ্গ ইতি নাম। তদেব ভঙ্গ্যন্তরেণ উক্তং যথা

তৌতাতিতা ইতি।” (কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ৫৪৬ সং পুথির ২৯ ক পত্র)। কমলাকর ভট্টও লিখিয়াছেন, “অভিনবগুপ্তপাদা ইতি বলভীভুজঙ্গ-নাম্নো ভবদেবস্য সংজ্ঞা, বহুবচনশ্রীপদাভ্যাং সংমতত্বমুক্তম্।” (কাশী সং, ৮ পত্র) ভীমসেন দীক্ষিতকৃত কাব্যপ্রকাশের ‘সুধাসাগর’ টীকায় বালবলভীভুজঙ্গ পদের রহস্য বিবৃত হইয়াছে:—“ইদমত্র রহস্যম্। পুরা কিল কাচিৎ বলভী পঠতাং বহূনাং ব্রাহ্মণবালানামধ্যয়নশালা আসীৎ। তত্র পঠন্ কশ্চিদ্-গৌড়বালোঽতিসৌবুধ্যান্মুখরত্বাচ্চ নিখিলবালানাং ভয়প্রদত্বেন বালবলভীভুজঙ্গ ইতি গুরুণা ব্যপদিষ্টঃ স চাচার্যতামুপগত ইতি সকলরহস্যাভিজ্ঞঃ শ্রীবাগ্‌দেবতাবতারো (মম্মটঃ) গূঢ়ং তন্নাম অভিনবগোপানসীগুপ্তপাদঃ ইতি বৈদগ্ধ্যমুখেনাভিব্যনক্তীতি। অতএব মধুমত্যাং রবিভট্টাচার্য্যৈরুক্তম্—অভিনবপদেন ধ্বনিটীকাকর্তৃপুরাণ-গুপ্তপাদলিখনবিরোধোঽত্র ন দেয়ঃ ইতি।” (চৌখাম্বা সং, পৃ. ১২১) অর্থাৎ কোন অধ্যাপক-গৃহের বলভীতে অর্থাৎ উচ্চতম কক্ষে বালকদের অধ্যয়নশালা ছিল। পঠদ্দশায় ভবদেব তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে গুরুর নিকট এই পদবী লাভ করেন। এই ব্যাখ্যার অনেকাংশে সমর্থন ভবদেবের নিজের উক্তি হইতেই পাওয়া যায়। তৌতাতিতমততিলকের প্রারম্ভে আছে:—

> মামধ্যয়নদশায়ামুবাচ বাচং দর্শি (?) স্বপ্নে।
> বালবলভীভুজঙ্গাপরনামা ত্বমসি ভবদেব!।
> তেনায়মুদ্যমো মে বিদ্যাদর্পান্ন জাতু সংজাতঃ।
> তস্মাদিহাবধানং বিধাতুমধিকুর্ব্বতে সুধিয়ঃ। (২-৩ শ্লোক)

‘দর্শি’ পদটি অর্থহীন। সম্পাদক ‘দেবী’ পাঠ অনুমান করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ‘দেশিকঃ’ পাঠ হইবে। শ্লোকানুসারে পঠদ্দশায় স্বপ্নে ভবদেব এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভুজঙ্গ শব্দ দ্বারা এখানে বিদ্যাদর্প কিম্বা ভীতি সূচিত হয় নাই। সহাধ্যায়ী বালকদের উপর অনুকম্পামূলক প্রভুত্বই সূচিত হইয়াছে—পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। তদনুরোধে রচিত হওয়ায় গ্রন্থে পাণ্ডিত্যবিজৃম্ভণ অপেক্ষা সরল বিবৃতিই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, বালবলভী পদে কোন স্থাননাম গৃহীত হয় নাই।

ভবদেবপ্রশস্তির নূতন সম্বাদ

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত প্রিন্সেপ সাহেব ভবদেবের কুলপ্রশস্তির পাঠোদ্ধার করেন (J. A. S. B., 1837, pp. 88-97)। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন যে, এই প্রস্তরলিপি কাঁহার দ্বারা উপহৃত হইয়াছিল জানিতে পারা যায় নাই (We cannot discover by whom the stone was presented to the Society. p. 88)। ঐ বৎসরই প্রস্তরটি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে General Stewart কর্তৃক ভুবনেশ্বর হইতে আনীত প্রস্তরদ্বয়ের অন্যতর ভ্রমে ভুবনেশ্বরমন্দিরে প্রেরিত এবং সংযোজিত হইয়া শতাব্দব্যাপী এক বিচিত্র ঐতিহাসিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। ১০০ বৎসর পরে এই ভ্রম ধরা পড়িয়াছে—ভবদেবের

কুলপ্রশস্তি ভুবনেশ্বরমন্দিরের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কবর্জ্জিত বটে (Proc., Indian Hist. Congress, Calcutta, 1939, pp. 287-315)। ভবদেবপ্রশস্তি বঙ্গদেশেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সম্প্রতি এ বিষয়ে অভিনব তথ্য অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিখিত হইল। নবদ্বীপরাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ নদীয়া জিলার বহিরগাছিনিবাসী ছিলেন। তাহার গৃহস্থিত হস্তলিখিত পুস্তকরাশির মধ্যে পুরাতন পুরু বিলাতী কাগজে লিখিত ভবদেবপ্রশস্তির পাঠ আবিষ্কৃত হয়। কাগজটি ৪ টুকরা হইয়াছিল, মধ্যের একটি টুকরা পাওয়া যায় নাই। কাগজটির জলছাপ Portal & Bridget। লিপিপাঠের পর পাঠোদ্ধারকারী তিনটি স্বরচিত শ্লোকে নামধাম লিখিয়া অতি মূল্যবান্ তথ্য সূচনা করিয়াছেন।

> ইত্যেষা কবিরাজিরাজরচিতা রম্যা সুপদ্যাবলী
> পাষাণোপরি ভট্টপাদবিদুষাং সদ্বংশকীর্ত্ত্যুত্তরা।
> **ঢক্কায়াং** পুরি পাথিবেন কৃতিনা পদ্যার্থজিজ্ঞাসুনা
> চানীতা বুধবর্য্যসংসদি মুদা সন্দর্শিতাপ্যাদরাৎ।
> রাজাজ্ঞয়া রাজপুরস্কৃতেন **শ্রীরাজচন্দ্রদ্বিজপণ্ডিতেন**।
> উদ্ধারিতাস্ত্রিংশতুরীয়সংখ্যাঃ শ্লোকাস্তু শেষশ্চ বিলুপ্তবর্ণঃ।
> ধরাধীশ্বরনির্ণাতগুণিসংসদি সাম্প্রতং।
> সংপ্রেষান্তে সুবোধার্থা পঙ্ক্ত্যস্ত্রাস্তি সংশয়ঃ।

প্রথম শ্লোকে "পাটিসেনকৃতিনা" লিখিত ছিল, পরে 'পাথিবেন'রূপে পরিবর্ত্তন করা হয়। J. D. Paterson এক সময়ে ঢাকার জজ ছিলেন (১৭৯১-৯৫ খ্রীঃ মধ্যে)। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পর তাঁহার কর্ম্মস্থল আমরা জানিতে পারি নাই। ১৭৮১ খ্রীঃ হইতে তিনি মুর্শিদাবাদ ছিলেন। Asiatic Researches, Vol. IX (1807)এ ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার এক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে তাঁহার চিত্র রক্ষিত আছে। ঢাকা অবস্থানকালে তিনিই (সম্ভবতঃ ১৭৯১-৯৫খ্রীঃ মধ্যে) ভবদেবের প্রস্তরলিপি আবিষ্কার করিয়া পাঠোদ্ধারের জন্য জজ-পণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কারের হস্তে অর্পণ করেন। উক্ত রাজচন্দ্র দীর্ঘকাল ঢাকা-প্রবিন্সিয়েল কোর্টের পণ্ডিত ছিলেন এবং ঐ পদে অবস্থানকালে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গী হন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৫০)। তাঁহার নিবাস ছিল নদীয়া জেলার বেলগড়ে মালিপোতা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক কুলগ্রন্থের মধ্যে একটি পৃথক্ পত্রে তাঁহার নামধাম সহ "সাং বাঙ্গলাবাজার" লিখিত আছে। ঠিক কোন্ সময়ে উক্ত প্রস্তরখণ্ড সোসাইটিতে অর্পিত হয়, নির্ণয় করার উপায় নাই। সোসাইটির শিলালিপি-সংগ্রহে ইহার ক্রমিক সংখ্যা ২ ("marked No 2") এবং প্রথম লিপিটির উপহারকাল ১৭২৩ শকাব্দ (১৮০১-২খ্রীঃ) বলিয়া জানা যায় (J.A. S.B., Vol. VI., p. 663)। সুতরাং অনুমান হয়, প্রায় ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে ভবদেবপ্রশস্তি সম্ভবতঃ উক্ত Paterson কর্ত্তৃক সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল। প্রিন্সেপ সাহেবের প্রায় ৪০ বৎসর

পূর্ব্বে উক্ত মহাপণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কার শিলালিপিটির প্রায় বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার পাঠ যথাযথ মুদ্রিত হইল। তিনি স্বয়ং পাঁচ স্থলে সংশয়াপন্ন ছিলেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥ গাঢ়োপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্র-মুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ মালুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি বাগ্‌দেবতোপহসিতোস্ত হরিঃ শ্রিয়ে বঃ॥

বাল্যাৎ প্রভৃত্যহরহর্যদুপাসিতাসি বাগ্দেবতে তদধুনা ফলতু প্রসীদ। বক্তাস্মি ভট্ট-ভবদেবকুলপ্রশস্তিসূক্তাক্ষরাণি রসনাগ্রমধিশ্রয়ে ত্বা॥ (পরে শ্রয়েথাঃ করা হয়)

সাবর্ণস্য মুনের্ম্মহীয়সি কুলে যে জজ্ঞিরে শ্রোত্রিয়াস্তেষাং শাসনভূময়ো জনিগৃহং গ্রামাঃ শতং সন্তু তে। আর্য্যাবর্ত্তভুবাং বিভূষণমিহ খ্যাতস্তু সর্ব্বাগ্রিমো গ্রামঃ সিদ্ধল এব কেবলমলঙ্কারোস্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ॥

সৎপল্লবঃ স্থিতিময়ো দৃঢ়বদ্ধমূলঃ শাখাগ্রলগ্নমুখরদ্বিজশীলিতশ্রীঃ। ন গ্রন্থিলো ন কুটিলঃ সবলঃ সুপর্ব্বা সর্ব্বোন্নতঃ সুখমিহ প্রসসার বংশঃ॥

তদ্বংশোত্তংসমণেঃ শ্রীদাতাপি (×) তাপণপ্রতি(মঃ)। ভব ইব বিখ্যাতম্বপ্রভবঃ প্রবভূব ভবদেবঃ॥ (৬-১৫ শ্লোকের পাঠ নাই) যন্মন্ত্রশক্তিসচিবঃ স চিরং চকার রাজ্যং সুধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেবঃ। তন্নন্দনে চলতি যস্য চ দণ্ডনীতিবর্ত্মানুগা বহুলকল্মলতেব লক্ষ্মীঃ॥

সৎপাত্রস্য মহাশয়স্য কমলাধাবস্য যস্য ক্ষমাস্বিভ্রাণস্য গুণাম্বুধেরকলিতস্যাম্বর্ন দীনাত্মনঃ। মর্য্যাদামহিমপ্রসাদশুচিতাগাম্ভীর্যধৈর্য্যস্থিতিপ্রায়াঃ প্রায়শ এব বাক্‌পথমতিক্রান্তাস্তদস্তে গুণাঃ॥

মহাগৌরীকীর্ত্তিঃ স্ফুরদসিকরালা ভুজলতা রণক্রীড়া চণ্ডীরিপুরুধিরচর্চ্চা রণভুবঃ। মহালক্ষ্মীমূর্ত্তিঃ প্রকৃতিললিতাস্তা গির ইতি প্রপঞ্চঃ শক্তীনাং যমিহ পরমেশং প্রথয়তি॥

যদ্ব্রহ্মতেজসি বলীয়সি মন্দবীর্য্যঃ খদ্যোতপোতকরণিং তরণিস্তনোতি। উচ্চৈরুদঞ্চতি যদীয়যশঃশরীরে জাতস্তুষারশিখরী নব জাম্বুদঃ॥

ব্রহ্মাদ্বৈতবিদামুদাহরণভূরদ্ভূতবিদ্যাদ্ভুতস্রষ্টা ভট্টগিরাং গভীরিমগুণপ্রত্যক্ষদৃশ্বা কবিঃ। বৌদ্ধাম্ভোনিধিকুম্ভসম্ভবমুনিঃ পাষণ্ডবৈতণ্ডিকপ্রজ্ঞাখণ্ডনপণ্ডিতোয়মবনৌ সর্ব্বজ্ঞলীলায়তে॥

সিদ্ধান্ততন্ত্রগণিতার্ণবপারদৃশ্বা বিশ্বাদ্ভুতপ্রসবিতা ফলসংহিতাসু। কর্ত্তা স্বয়ং প্রথয়িতা চ নবীনহোরাশাস্ত্রস্য যঃ স্ফুটমভূদপরো বরাহঃ॥

যো ধর্ম্মশাস্ত্রপদবীষু জরন্নিবন্ধানন্ধীচকার রচিতোচিতসৎপ্রবন্ধঃ। স্বব্যাখ্যয়া বিশদয়ন্মু-নিধর্ম্মগাথাঃ স্মার্ত্তক্রিয়াবিষয়সংশয়মুন্মমার্জ্জ॥

মীমাংসায়ামুপায়ঃ স খলু বিরচিতো যেন ভট্টোক্তনীত্যা যত্র স্থায়াঃ সহস্রং রবিকিরণসমা ন ক্ষমন্তে তমাংসি। কিং ভূম্না সীম্নি সাম্নাং সকলকবিকলাস্বাগমেষ্বর্থশাস্ত্রেষ্বায়ুর্ব্বেদাস্ত্রবেদপ্রভৃতিষু কৃতধীরদ্বিতীয়োয়মেব॥

যস্য খলু বালবলভীভুজঙ্গ ইতি নাম নাদৃতং কেন। মীমাংসয়াপি সপুলকমাকর্ণিতোদ্গীতং॥

দংষ্ট্রালদুষ্টভুজগব্রণমোহরাত্রি-প্রত্যূষতুর্য্যনিনদৈরিব মন্ত্রবর্ণৈঃ। যো জীবয়ন্ জগদশেষম-ভূদপূর্ব্বমৃত্যুঞ্জয়ো গরলকেলিষু নীলকণ্ঠঃ॥

রাঢ়ায়ামজলাসু জাঙ্গলপথগ্রামোপকণ্ঠস্থলী-সীমাসু শ্রমমগ্নপান্থপরিষৎ-প্রাণাশয়প্রীণনঃ।
যেনাকারি জলাশয়ঃ পরিসরস্নাতাভিজাতাঙ্গনা-বক্ত্রাব্জপ্রতিবিম্বমুগ্ধমধুপীশূন্যাব্জিনীকাননঃ ॥

তেনায়ং ভগবান্ ভবার্ণবসমুত্তারায় নারায়ণঃ শৈলঃ সেতুরিব প্রসাধিত-ধরাপীড়ঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ। যঃ প্রাচীবদনেন্দুনীলতিলকো লীলাবতংসোৎপলং ভূমেভূর্তলপারিজাতবিটপী সঙ্কল্পসিদ্ধিপ্রদঃ ॥

তেন প্রাসাদ এষ ত্রিপুরহরগিরিস্পর্দ্ধয়া বর্দ্ধিতশ্রীঃ শ্রীমান্ শ্রীবৎসলক্ষ্মা হরিরিব বিহিতো বিস্ফুরচ্চক্রচিহ্নঃ। জিত্বা যোধৈর্জ্জয়ন্তং বিয়তি বিতনুতে বৈজয়ন্তীবিলাসান্ কৈলাসেনাভিলাষং কলয়তি গিরিশো যস্য সংলক্ষ্য লক্ষ্মীং ॥ ন্যবীবিশদেষ্মনি তত্র বিষ্ণোঃ স নির্ভরং গর্ভগৃহান্তরেষু। নারায়ণোঽনন্তনৃসিংহমূর্ত্তীর্বিধাতৃবক্ত্রেম্বিব বেদবিদ্যাঃ ॥

এতস্মৈ হরিমেধসে বসুমতীবিশ্রান্তবিদ্যাধরীবিভ্রান্তিন্দধতীঃ শতং স হি দদৌ শারঙ্গ-শাবাদৃশঃ। দগ্ধস্যোগ্রদৃশা দৃশৈব দিশতীঃ কামস্য সংজীবনং কারাঃ কামিজনস্য সঙ্গমগৃহং সঙ্গীতকেলিশ্রিয়াঃ ॥

প্রাসাদাগ্রে স খলু জগতঃ পুণ্যপাণ্যৈক(×)-বীথীং চক্রে বাপীং মরকতমণিস্বচ্ছ-স্বচ্ছায়তোয়াং। মধ্যে বারিপ্রতিকৃতিমিষাদ্দর্শয়ন্তীব তাদৃগ্ বিষ্ণোর্ধামাদ্ভুতমহিকুলস্যাধিকং যা চকাস্তে ॥

ব্যধিতবিবুধধাম্নঃ সীম্নি সংসারসারং স খলু নিখিলনিত্যানন্দনিস্যন্দপাত্রং। ত্রিভুবন-জয়খিন্নানঙ্গবিশ্রামধাম প্রথিতরতিবিভাবস্থানমুদ্যানরত্নং ॥

তস্যৈব প্রিয়সুহৃদা দ্বিজাগ্রিমেণ শ্রীবাচস্পতিকবিনা কৃতা প্রশস্তিঃ। আকল্পং শুচিসুরধামমূর্ত্তিকীর্ত্তিরধ্যাস্তাং জঘনমিয়ং সুপদ্যকাঞ্চী ॥

যশসি ধিয়ং বাসবলভীভুজঙ্গমনাম্নো ভট্টশ্রীভবদেবস্য ॥

প্রশস্তির বর্ত্তমান পাঠের সহিত (Ins. of Bengal, pp. 32-35) উদ্ধৃত পাঠ তুলনা করিলে খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে সুপণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কারের লিপিপাঠে অপূর্ব্ব সাফল্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রিন্সেপ কিম্বা তদীয় দক্ষিণহস্ত কমলাকান্ত বিদ্যা-লঙ্কারও এত দূর সাফল্য লাভ করেন নাই। রাজচন্দ্রই বঙ্গদেশে এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলিয়া চিরস্মরণীয় হইবেন।

প্রশস্তিটির "ঢক্কাপুরী"তে প্রথম "আনয়নে"র এই নূতন সম্বাদ হইতে ইহার আবিষ্কারস্থান সম্বন্ধে অভিনব আলোচনা কর্ত্তব্য হইয়াছে। ১৭৯১-৯৫ খ্রীঃ মধ্যে জজ্ পাটিসেন সাহেব ইহা আনিয়াছিলেন। তৎকালে Judge ও Magistrate সংযুক্ত পদ ছিল এবং তাঁহাকেই জিলা পরিদর্শন করিতে হইত। Collector পৃথক্ পদ ছিল। সুতরাং অনুমান করা চলে যে, ঢাকা জিলার মধ্যেই কোন স্থানে ইহা আবিষ্কৃত হইয়া উক্ত সাহেব কর্ত্তৃক ঢাকা শহরে আনীত হইয়াছিল। তখন Asiatic Society স্থাপিত হইয়াছে এবং রাজচন্দ্র তাঁহার পাঠোদ্ধার যে "ধরাধীশ্বরনির্ণীতগুণিসংসদি" প্রেরণ করেন, তাহা উক্ত Society হওয়াই সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় অঞ্চলে এই প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলে কলিকাতা ডিঙ্গাইয়া ঢাকায় আনা অসম্ভব

বলিয়া মনে হয়। প্রশস্তির মধ্যেই আমাদের অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। যোড়শ শ্লোকের শেষার্দ্ধ এই—"তন্নন্দনে বলতি যস্য চ দণ্ডনীতিবর্ত্মানুগা বহুলকল্পলতেব লক্ষ্মীঃ।" 'চলতি' অপেক্ষা 'বলতি' (বল্ প্রাণনে ধাতু হইতে) পাঠ সাধীয়ান্। 'যস্য' পদের অন্বয় লক্ষ্মীর সহিত নহে, পরন্তু দণ্ডনীতিবর্ত্মের সহিত। ভবদেবের নীতিপথ অনুবর্ত্তন করিয়া রাজ্যলক্ষ্মী হরিবর্ম্মদেবের তনয়ে সজীব অবস্থান করিতেছেন। 'বলতি' পদের বর্ত্তমানকালে প্রয়োগ হইতে বুঝা যায়, প্রশস্তিরচনাকালে উক্ত রাজতনয় জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বজনবিদিত নাম উল্লেখ করা অনাবশ্যক ছিল। ভবদেবও তখন মন্ত্রিত্ব করিতেছিলেন—নিশ্চয়ই উত্তর-রাঢ়ে তাঁহার পৈতৃক ভূমি হইতে নহে, পরন্তু হরিবর্ম্মের রাজধানী "বিক্রমপুরে" বসিয়াই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দিরও বিক্রমপুরেই অবস্থিত ছিল, অন্যত্র নহে। ২৬ ও ২৭ শ্লোকদ্বয়ের মূল বাক্য হইল, "রাঢ়ায়াং যেন জলাশয়ঃ অকারি তেনায়ং শৈলঃ নারায়ণঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ।" অর্থাৎ যিনি **রাঢ়দেশে** জলাশয় করিয়াছিলেন, তিনিই **এই** মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বাক্যের অন্বয় প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মন্দিরটির অবস্থান রাঢ়দেশের মধ্যে হইতেই পারে না, রাঢ়বহির্ভূত দেশেই ছিল। ২৭ শ্লোকের "অয়ং" এবং ২৮ শ্লোকের "এষ" পদ হইতে বুঝা যায়, মন্দিরের অবস্থান তৎকালে সর্ব্বজনবিদিত ছিল। যদি তাহা রাঢ়ে হইত, তবে ২৬ শ্লোকের 'বিধেয়াংশে' রাঢ়ার উল্লেখ ব্যাকরণদুষ্ট এবং অন্বয়রহিত হয়। ১৬ শ্লোকের সহিত একান্বয় করিলে সন্দেহ থাকে না যে, মন্দিরটি রাজধানী বিক্রমপুরেই অবস্থিত ছিল। ভবদেবের পিতামহ বঙ্গরাজের মন্ত্রী ছিলেন (১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ৩ পুরুষ যাবৎ তাঁহারা বঙ্গের অধিবাসী। কিন্তু আদিভূমির মর্য্যাদা তাঁহারা রক্ষা করিয়াছিলেন। ভবদেবের কীর্ত্তিগণনায় তজ্জন্যই নিজ-রাজ্য 'বঙ্গে'র বাহিরে রাঢ়দেশে জলাশয় করার উল্লেখ রহিয়াছে। ভবদেব প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তির বর্ণনায় একটি বিশেষণপদ আছে "**প্রাচী**-বদনেন্দুনীল-তিলকঃ" (২৭ শ্লোক)। বাঙ্গালীর রচনায় প্রাচী বলিতে উত্তররাঢ় অপেক্ষা বিক্রমপুর অর্থই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে। ভবদেবের বিপুল পাণ্ডিত্য ও ঐশ্বর্য্য সুতরাং বিশেষভাবে বিক্রমপুরেরই লুপ্তোদ্ধৃত কীর্ত্তিরূপে গ্রহণযোগ্য।

ভবদেবের অভ্যুদয়কাল

স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিচারপূর্ব্বক খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ (১০৫০-১১০০খ্রীঃ) ভবদেবের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা প্রায় অভ্রান্ত। ভবদেব ধারেশ্বর ভোজদেবের (১০১০-৫৫খ্রীঃ) নাম করিয়াছেন, সুতরাং ১০৭৫খ্রীঃ তাঁহার অভ্যুদয়কালের ঊর্দ্ধতন সীমা ধরা যায়। পক্ষান্তরে বিজয়সেন কর্ত্তৃক বিক্রমপুর অধিকারের পূর্ব্বেই তাঁহার কুলপ্রশস্তি রচিত হয়, তখন তাঁহার উন্নতি চরম সীমায় পৌছিয়াছে। ১১৫০খ্রীঃ তাঁহার অভ্যুদয়কালের অধস্তন সীমা ধরা যায়। হরিবর্ম্মের কালনির্ণয় ইহা সমর্থন করিবে

সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে হরিবর্ম্মা জাতবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও অব্যবহিত পরবর্ত্তী এবং সামলবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বলিয়া ধরা হয় (Hist. of Bengal, 1, pp. 200-304)। তাঁহার অন্যূন ৪৬ বৎসরব্যাপী সুদীর্ঘ রাজত্বকাল ১০৫০-১১২৫ খ্রীঃ মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। কালচক্রটীকার পুথির লিপিকাল "মহারাজাধিরাজ-শ্রীমৎহরিবর্ম্মদেবপাদীয় সম্বৎ ৩৯। সূর্য্যগত্যা আষাঢ়দিনে ২৯॥" Des. Cat. of Buddhist Mss., A. S. B., p. 79) ইহার পর ভিন্নহস্তে তিনটি দুরূহার্থ শ্লোক লিখিত আছে ঃ

ষট্‌চত্বারিংশতি গতে বৎসরে হরিবর্ম্মণঃ।
মাঘস্য কৃষ্ণসপ্তম্যাং একাদশদিনে গতে ॥
মৃতয়া চুঞ্চুদুকয়া গৌর্য্যা স্বপ্নেন দৃষ্টয়া।
কনিষ্ঠাঙ্গুলিমাদায় পৃষ্টয়েদমুদিরিতম্ ॥
পূর্ব্বোত্তরে দিশো ভাগে বেংগনস্থাস্তথা কূলে।
পঞ্চস্থং ভাষিতবতঃ সপ্তসম্বৎসরৈরিতি ॥

শ্রদ্ধেয় ডকটর ভট্টশালী মহাশয় এই লিপির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার সহিত আলোচনায় শ্লোকত্রয়ের এইরূপ অর্থ আমাদের নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। গ্রন্থের স্বত্বাধিকারীর আত্মীয়া "গৌরী" নাম্নী কোন রমণী স্বপ্নে মৃতা চুঞ্চুদুকানাম্নী অপর রমণীর দর্শন পাইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি ধরিয়া তাহাকে (চুঞ্চুদুকাকে) প্রশ্ন করায় (পৃষ্টয়া, চুঞ্চুদুকয়া পদের বিশেষণ) ইহা পাঠ করা হয়। হরিবর্ম্মার ৪৬ অতীত বৎসরে অগ্র মাঘের ১১ দিবসে কৃষ্ণা সপ্তমীতে ৭ বৎসরে ৫ বার পড়া হইল। "মাঘের ১১ তারিখ কৃষ্ণা সপ্তমী" প্রতি বৎসর ঘটে না—সুতরাং ইহার গণনা দ্বারা হরিবর্ম্মার রাজ্যারম্ভের একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ হস্তগত হইল। ১১০০-১১৫০খ্রীঃ মধ্যে তিনটি মাত্র বৎসরে মাঘের ১১ তারিখে কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি ঘটিয়াছিল— ১১০০, ১১১৯ ও ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি সৌর মানে ১১ মাঘ কৃষ্ণা সপ্তমী যথাক্রমে ৪০ দণ্ড, ৫২ দণ্ড ও ৩ দণ্ডব্যাপী ছিল। '৪৬ গতে বৎসরে' অর্থ বর্ত্তমান ৪৭ বৎসর। কিন্তু "একাদশ দিনে গতে" অর্থ মাঘের ১২ তারিখ নহে ; কারণ, বঙ্গদেশে সৌর মান "অতীত"-রূপেই গণিত হয়। আমাদের ১১ মাঘ পশ্চিমাঞ্চলে ১২ মাঘ। উক্ত তিনটি বৎসরের মধ্যে ১১১৯ সনই গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নাই। তদনুসারে **১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে হরিবর্ম্মার রাজ্যারম্ভ** পাওয়া যায় এবং ভবদেবের অভ্যুদয়কাল ১০৭৫-১১২৫ সন মধ্যে নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা যায়।[৩] জীমূতবাহন তাঁহার সমসাময়িক, কল্পতরুকার লক্ষ্মীধর কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী এবং বিজ্ঞানেশ্বরও সমসাময়িক। একমাত্র স্মৃতিমঞ্জরীকার গোবিন্দরাজ ইঁহাদের সকলেরই পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। গোবিন্দরাজও বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া অনুমান করার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে।

৩। ১১৩৮ সন গ্রহণ করিলে হরিবর্ম্মার রাজ্যারম্ভ হয় ১০৯১ সনে এবং ভবদেবের অভ্যুদয়কাল হয় ১০৯০-১১৪০ সন। ইহাও অসম্ভব নহে, কিন্তু সামলবর্ম্মাকে তাহা হইলে হরিবর্ম্মার পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হয়।

ভবদেবের কুলপরিচয়

ভবদেবের কুলপ্রশস্তির ৩-১৩ শ্লোকে তাঁহার কুলপরিচয় ও ঊর্দ্ধতন ৭ পুরুষের নামমালা লিখিত আছে। রাঢ়ান্তর্গত 'সিদ্ধল' গ্রাম তাঁহার বংশের আদিস্থান এবং তিনি সাবর্ণ গোত্রীয় ('সাবর্ণি' নহে) ছিলেন। তাঁহার পিতামহের সঙ্গে বোধ হয় এই বংশেরই অপর একটি শাখা বঙ্গে আশ্রয় নিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মার বেলাবশাসনে রাজার শান্ত্যাগারাধিকৃত যজুর্ব্বেদী এই শাখার পরিচয় প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত তথ্য লিখিত হইয়াছে— বংশটি "মধ্যদেশবিনির্গত উত্তররাঢ়ায়াং সিদ্ধলগ্রামীয়"। রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রে সাবর্ণ গোত্র সিদ্ধল-গাঞি যথাযথ উল্লিখিত হইয়াছে এবং "মধ্যদেশবিনির্গত" পদে কুলশাস্ত্রোক্ত কান্যকুব্জ প্রবাদের সমর্থনও পাওয়া যাইতেছে। রাঢ়ীয় শ্রেণীর গাঞিগুলি যে রাঢ়দেশের মধ্যেই অবস্থিত কুলস্থান হইতে উদ্ভূত, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। ভবদেবের ঊর্দ্ধতন ৭ম পুরুষ আদি "ভবদেব" গৌড়াধিপতির নিকট শাসনগ্রাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন (৭ শ্লোক)। ভবদেবের জন্মাব্দ ১০৫০ খ্রীঃ ধরিয়া এবং এক পুরুষের গড়পড়তা ৩৫ বৎসর ধরিয়া (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ১১৮) আদি ভবদেবের জন্মাব্দ হয় ৮৪০ খ্রীঃ। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক গৌড়নৃপ সুতরাং নারায়ণপাল হওয়া সম্ভব। সিদ্ধলগ্রামীদের আদিপুরুষ আদি ভবদেব হইতে অন্ততঃ ৪।৫ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী হইবেন। সুতরাং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের 'গাঞি' উৎপত্তির কাল পালবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে হওয়াই সম্ভব।

সিদ্ধলগ্রামী শ্রোত্রিয়বংশ এখন অত্যন্ত বিরল। আমরা একটি মাত্র বংশের সন্ধান পাইয়াছি। ত্রিবেণীর পালধিবংশীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মাতামহ বাসুদেব ব্রহ্মচারী সিদ্ধলগ্রামী ছিলেন। এই ব্রহ্মচারিবংশ এখনও বিদ্যমান আছে। কুলগ্রন্থেও সিদ্ধলগ্রামীর উল্লেখ অত্যন্ত বিরল। অবসথী চট্ট দোকড়ির সন্তান জয়পতির পৌত্র ও গোপালের পুত্র ভৈরব সম্বন্ধে লিখিত আছে, "ততঃ কন্যা সিদ্ধলগ্রামীতপনেন নীতা হানিঃ।" [(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সং পুথির ২৪৫ খ পত্র)] কুলীনের কন্যাগ্রহণ সমৃদ্ধি সূচনা করে। বিক্রমপুর অঞ্চলে সিদ্ধলগ্রামী শ্রোত্রিয় এখনও বিদ্যমান আছে কি না অনুসন্ধানযোগ্য। ভট্ট ভবদেবের বংশধারা এখনও আত্মবিস্মৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিতে পারে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে কিছু নূতন তথ্য প্রকাশিত হইল, তাহা সবই পুথি আলোচনার ফলে। কলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ সঞ্চিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের কিম্বা পৃথিবীর অন্য কোন একটি স্থানে এত পুথি আছে কি না সন্দেহ। আমরা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে জোর করিয়াই বলিতে পারি, এই সকল পুথির মধ্য হইতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া বাঙ্গলার এবং ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নিত্য নূতন আলোকপাত করিবে। কিন্তু কলিকাতায় সংস্কৃতপুথি আলোচনাকারী গবেষক প্রায় নাই বলিলেই চলে এবং এ ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর ঘরের জিনিষ পরের হাতে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম

হইয়াছে। কলিকাতার পুথি হইতেই বহু বিদেশী পণ্ডিত নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এ বিষয়ে বাঙ্গলার শিক্ষিতসম্প্রদায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বাঙ্গলার মুখ রক্ষা করুন, ইহাই আমাদের কামনা। উপসংহারে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত ভবদেবের কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতির একটি ১৭১৫ শকের প্রতিলিপিতে যে বিচিত্র 'পুষ্পিকা' পাওয়া যায়, তাহা উদ্ধৃত হইল: (Des. Cat. Smriti., p. 465)—"ইতি বালবড়ভীভুজঙ্গ-ভুজাভিমতবিপক্ষপ্রতিবৈনতেয়-পাষণ্ডখণ্ডননাগরিগোত্তক-বাচস্পতিশরণ-কেলিনীলকণ্ঠ-ভট্ট-শ্রীভবদেব…।" এ স্থলে পাঁচটি পদবীর মধ্যে চারিটিতে তিনি ভুজঙ্গ, গরুড়, নাগরিকোত্তম (? অর্থাৎ পুলিশ-কমিশনর) ও নীলকণ্ঠ অর্থাৎ ময়ূরের সহিত তুলিত হইয়াছেন। "বাচস্পতি-শরণ" পদে যদি কুলপ্রশস্তিকার তদীয় সুহৃৎ কবি বাচস্পতির আশ্রয় অর্থ হয়, তাহা হইলে আশ্চর্য্যের কথা যে, এত আধুনিক পুথিতে তাহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ভবদেবের এই গ্রন্থ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিদ্যমান আছে, কিন্তু এইরূপ অদ্ভুত পুষ্পিকা অন্য কোন পুথিতে পাওয়া যায় কি না অনুসন্ধানযোগ্য।